কার্ল মার্ক্সের সাহিত্য সমগ্র

অনুবাদ ও সম্পাদনা

রথীন চক্রবর্তী

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ
১৪ই মার্চ ১৯৪৮

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫ ১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রবীর সেন

মুদ্রক
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী
ক্যালকাটা সিটি প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ এক ॥

পিতৃবন্ধু লুডভিগ ফন ভেস্টফালেনের কন্যা য়েনীর সঙ্গে যখন মার্ক্স প্রেমে পড়লেন তখন তাঁর বয়েস সতেরো। ভেস্টফালেনের আন্তরিক স্নেহ মার্ক্সকে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিল। আর এখানেই মার্ক্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে ঈসকাইলাস, শেক্সপীঅর এবং সার্ভেন্তিসের। সেইসঙ্গে য়েনীর, যিনি মার্ক্সের দিদি সোফির বন্ধু, মার্ক্সের চেয়ে বয়েসে চার বছরের বড। এই প্রেম গভীরতর পর্বে পা বাড়াবার আগেই মার্ক্সকে শৈশব এবং কৈশোরের ট্রিয়ের শহর ছেড়ে চলে আসতে হয় বনে, কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৩৫-৩৬ সালেব এই দুরন্ত সময় মার্ক্সের জীবনের বহুচিত্রিত এক অধ্যায়।

বহুচিত্রিত এই কারণে, একদিকে শ্লেগেলের কাছে হোমার-চর্চা; গ্রীক এবং লাতিন সাহিত্যে অভিনিবেশ, জুরিসপ্রুডেন্স এবং পলিটিকাল ইকনমি নিয়ে পড়াশোনা, অন্যদিকে য়েনীর জন্য বিরহ বেদনা—সব মিলিয়ে কখনও কাব্য কখনও সামাজিক যুক্তিবাদিতায় আচ্ছন্ন হয়েছে মার্ক্সের নিমগ্ন সংলাপ। বন-এর পোয়েটস ক্লাব-এর আসরে মার্ক্সের উৎসাহভরা উপস্থিতি সেক্ষেত্রে আরও কিছু রঙীন মুন্সিয়ানা। ১৮৩৬-এর ২২ অক্টোবর মার্ক্স পিতার পরামর্শে বন ছেড়ে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। সেখানে তখন আকাশ আলো করে আছেন হেগেল এবং তাঁর ভাবনা। যাঁর কাছে পাঠ নিয়েছেন লুডভিগ ফয়েরবাখ, ডেভিড স্ট্রাউস, ব্রুনো বাউয়ের প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। ফলে ১৮৩৬ একসময় ৩৭-এ পা রাখে। আর মার্ক্সের ভাবনায় আরো উজ্জ্বল হয় সাহিত্য এবং দর্শনের দিগন্ত। এই সময়ে মার্ক্স অজস্র চিঠি লেখেন য়েনীকে যাতে আছে তপ্ত হৃদয়ের আঁচ। বেশ কিছু চিঠি লেখেন তাঁর পিতাকেও যার প্রতিটি ছত্রে আছে সদ্য পরিচিত এই সাহিত্য ও দর্শনের জগৎ সম্বন্ধে নিজেরই নানা প্রশ্ন, নিজেরই নানা ব্যাখ্যা। এবং এই সময়েই য়েনীর প্রতি উষ্ণ প্রেমের আবেশ এবং ঈসকাইলাস ও শেক্সপীঅরের আলোকিত সীমান্তে ছুটে বেড়ানো আশ্চয অভিজ্ঞতায় জন্ম নেয় কিছু কবিতা। গ্যয়টের ধারালো চিত্রণ, আরিস্তোফেনেসের বিদ্যুতের মতো বিদ্রূপ, শেক্সপীঅরের প্রগাঢ়তা, ওভিদের নির্মাল্য এবং পিতার প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা, আর য়েনীকে আপন করে পাবার আর্তি—এই সব কিছু নিয়ে মার্ক্সের চিন্তা এবং অনুভবের আকাশ ছড়িয়েছিল

অজস্র শিশির, মুক্তোর মতো আজও যা ফুটে আছে, একটি কাব্যনাট্য একটি উপন্যাস এবং কিছু কবিতার ছায়ায়।

১৮৩৮ সালে, বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্স যখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, সেই সময়ে মারা যান তাঁর পিতা। মার্ক্সের কাছে এ-এক কঠিন আঘাত, প্রিয় বন্ধু-বিয়োগের মতোই। এই আঘাত মার্ক্সকে মনে পড়িয়ে দেয় ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পিতৃনির্দেশ, যে-কারণে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়তে আসা। এই আঘাতই আনে কাব্যচর্চায় যবনিকা, কিন্তু কখনই কাব্য উপলব্ধিতে নয়। বিরতির সূত্রে মার্ক্স নিমগ্ন হ'ন তার গবেষণালিপিতে, যাকে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দেয়নি যেহেতু মার্ক্স তখন বিদ্রোহী হেগেলপন্থী রূপে র‍্যাডিকাল মতামত ও নাস্তিক্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ চিন্তার পরীক্ষকদের এড়াতে মার্ক্স এলেন জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শন চিন্তার পার্থক্য' সম্পর্কে সেখানেই ডক্টরেট প্রাপ্তি। *এই থিসিস মার্ক্স উৎসর্গ করেছিলেন য়েনীর পিতাকে, ১৮৪২ সালে তিনি মারা যান।

১৮৩৮ সালে বের্লিনে আর্নল্ড রুগে-র সম্পাদিত হ্যালিশে ইয়ার বুখারে মার্ক্স প্রথম রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেও পাকাপাকিভাবে লেখা শুরু এই ৪২ থেকেই। এই বেয়াল্লিশেই তিনি লেখেন প্রাশিয়ান সেন্সর ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রথম আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ, যেটি পরে রুগে-র 'আনেকডোটা' কাগজে প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে। এই বেয়াল্লিশের এপ্রিল থেকেই তিনি রাইনিশে ৎজাইটুং পত্রিকায় লেখা শুরু করেন এবং ক্যোলনে গিয়ে এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্যোলন-এর কিছু ব্যাঙ্কার এবং শিল্পপতি ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। এখানে মার্ক্সের প্রকাশিত লেখাগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহের ব্যাপারে গরীব চাষীদের পক্ষে বিবৃতি ইত্যাদি। মালিকেরা মার্ক্সের কাজে সুখী ছিলেন না। তাছাড়া ১৮৪৩-এর জানুয়ারিতে প্রাশিয়ান সরকার পত্রিকাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তার মাস দুয়েক পরেই, ১৭ মার্চ মার্ক্সকে সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নিতে হয়। আর ঠিক তার তিন মাস ব্যবধানে ১৮৪৩-এর ১৯ জুন মার্ক্স য়েনীকে বিয়ে করলেন। প্রথম ভাব-ভালোবাসার দিন থেকে প্রায় সাতটি বছর গড়িয়ে যাবার পর। বিয়ের পর য়েনীকে নিয়ে মার্ক্স হনিমুনে গেলেন সুইটজারল্যাণ্ডে। এবং সেখান থেকে ফিরে ক্রয়েৎজনাখে বসে লিখলেন On the Jewish Question. ১৮৪৩ সালেই মার্ক্স পারীতে যান। এবং ১৮৪৪ সালে লেখেন The Economic and Philosophical Manuscript of 1844. এই ১৮৪৪-এই লেখা হয় আরেকটি বই Critique of

Critical Critique. ১৮৪৫ সালে যা প্রকাশিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে The Holy Family নাম নিয়ে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের যৌথ অভিযানের প্রথম ফসল। এই সহরে ফরাসী সরকার বহিরাগত জর্মনদের বিদায় দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করলে মার্ক্স চলে আসেন ব্রাসেলসে। সেখানে জন্ম নেয় দুটি লেখা। Thesis on Feuerbach এবং The Communist Manifesto. কিন্তু ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় বেশ কিছুদিন পরে, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে, লণ্ডন থেকে। এখান থেকেই কার্ল মার্ক্সের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু, যে-অধ্যায় সম্পর্কে আপাতত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই।

॥ দুই ॥

১৯২৯ সালের আগে পর্যন্ত ইওরোপের বুদ্ধিজীবীরা জানতেন না যে কার্ল মার্ক্সের জীবনে ১৮৩৬ এবং ৩৭ সাল কি আশ্চর্যরকমের উজ্জ্বল। কারণ ১৮৪১ সালের ২৩ জানুয়ারির Athenaum পত্রিকায় মাত্র দুটি কবিতা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া মার্ক্সের কোনো সাহিত্যকৃতিই কোনোদিন মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। কিন্তু ১৯২৯-এ তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য রচনা মূল জর্মনে প্রকাশিত হবার পরেও এনিয়ে আলোচনা তেমন ব্যাপক এবং আন্তরিক হ'তে পারেনি সম্ভবত ইংরেজিতে ভাষান্তর না হওয়ার জন্যই। ভারতবর্ষে মার্ক্স-চর্চা এখন পর্যন্ত একান্তভাবেই অঙ্কের মতো ছকে বাঁধা, যে-কারণে কোনো স্পন্দনের চিহ্ন নেই কোথাও। দু-একজন ভারতীয় এবং বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি দু-কদম এগিয়ে এসে বলেছেন, মার্ক্সের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার ফ্রানৎজ মেহরিং এসব নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস করেননি। আর তা না-কি করার কথাও নয়। কারণ এ-সব কবিতার সাহিত্যমূল্য সামান্যই, শুধুমাত্র জীবনীগত তাৎপর্যই না-কি লক্ষ্য করা যেতে পারে। সুখের কথা, এইসব বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করার মতো দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা আমাদের এখনও হয়নি।

মার্ক্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবার্ট পেইন তাঁর দ্য আননোন কার্ল মার্ক্স বইয়ের এক জায়গায় লিখছেন, 'সারা জীবন ধরে মার্ক্স নিজেকে শুধু উৎসর্গ করে গেছেন কবিতার কাছে,...তাঁর রক্তের প্রতিটি কণায় কবিতার সুর, কমিউনিস্ট বিশ্বের স্বপ্নকে বাদ দিয়ে মার্ক্সের পক্ষে যেমন বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না তেমনি কবিতাকে বাদ দিয়ে তাঁর পক্ষে চিন্তার প্রাসাদ গড়ে তোলাও ছিল অসম্ভব।'

পেইন যে একথা উচ্চারণ করার সময় কিছুমাত্র অতিরিক্ত ভাবাবেগে আপ্লুত হন নি তার প্রমাণ মার্কসের সারা জীবন, মার্কসের সমস্ত রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু করে ক্যাপিটাল পর্যন্ত। পেইন লিখছেন, মার্ক্সের কাব্যনাট্য অউলানেম সম্পর্কে : Long speech of Oulanem consigning the world of damnation & annihilation offers a clue to the real nature of the conflict he resolved in the Communist Manifesto. যেমন : আমরা যারা দেয়াল ঘড়ির মতো এক যন্ত্র যার দুচোখ অন্ধ / শুধুই ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো সময়কে বয়ে নিয়ে যায় / শুধুই ঘটে সেইটুকু যা ঘটার, আশ্চর্য রোমাঞ্চহীনতায় / এবং তারপর শেষ, নিশ্চিত ধ্বংস থাকে তারপর। অথবা : আর আমরা, বন্দী চিরকাল, ছিন্নভিন্ন, নিমজ্জিত শূণ্যতায়, / বন্দী পাথরের প্রতিটি মিনারে, / বন্দী, বন্দী, বন্দী অনন্ত সময়ের পাখায়। ঠিক এর পরের ছত্রই যেন ১৮৪৮-এর ইস্তাহারে স্থান পেয়ে গেছে ; সর্বহারাদের হারাবার কিছুই নেই, তাদের জয় করার রয়েছে সারা জগৎ। অবশ্যই এটা প্রমিথিউসের কথা, যে-প্রমিথিউস শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খল ভাঙতে পেরেছিল নিজেরই শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে। কবিতা থেকে উঠে আসা প্রমিথিউস মার্ক্সকে শুধু অউলানেমেই আচ্ছন্ন করেনি, ডিমোক্রিটাস এবং এপিকিউরাসের দর্শনচিন্তার পার্থক্য আলোচনাতেও ফিরে আসে সেই কণ্ঠস্বর : 'ধর্ম যার জ্যোতির্মণ্ডল সেই দুঃখের উপত্যকার বিরুদ্ধে জেহাদের বীজ হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ।'

কবিতার প্রাকার থেকে সংগ্রামের এই সোপানে পা রাখার চর্চা 'প্রফেট' হিসেবে নন্দিত হতে পারে কি-না তা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ক্রোচে যখন অবস্থাটাকে সংজ্ঞায় বোঝাবার চেষ্টা করেন, he who animated by a strong ethical spirit, proposes to his fellow-citizens, to his fellow-countrymen or to men in general, a direction to follow in life, তখন, পিটার ডেমেৎজ-এর ভাষায়, And finally a prophet becomes a poet. পেইন সম্ভবত এই অনুভবকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়েই বলেন, He was a prophet, a seer, an authority on all the arts & religion, and there was not one field of scientific endeavour to which he had not contributed new ideas. কারণ সব থেকে বড়ো হলো যেটা, কমিউনিজম মার্ক্সের নিজস্ব আবিষ্কার নয় এবং সামাজিক অবিচার ও সম্পদের বিপুল বৈষম্যের বিরুদ্ধে তর্জনীও মার্ক্স প্রথম তোলেননি। কিন্তু মার্ক্সই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘটনার অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন, বিশ্বের দেশে

দেশে বিপ্লবের দুন্দুভি। আমাদের স্বীকার করে নিতে কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না যে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থেকে এই সুরকে বেছে নিতে পারেন একমাত্র একজন কবিই, একমাত্র একজন কবিই পারেন বিপুল সম্ভাবনার আশায় চডান্ত বিপর্যয়কে স্বাগত জানাতে। যেমন মার্ক্স বলেন :

তবে বিষাক্ত দৃষ্টি তখন
আসুক ধ্বংস, অন্ধ পৃথিবীতে আসুক রোমাঞ্চের শিহরণ !

প্রসঙ্গত আর্তুর র‍্যাঁবো ;

সমস্ত রহস্যকে আমি নগ্ন করে দেবো—প্রকৃতির
রহস্য, ধর্মের রহস্য, জন্ম-মৃত্যু, অতীত-ভবিষ্যৎ,
রহস্য বিশ্বসৃষ্টির অথবা শূন্যতার।

পাশাপাশি গ্যয়টের মেফিস্টোফিলিস :

Now that's the very spirit for the venture.
I'm with you straight, we'll draw up an indenture :
I'll show you arts and joys, I'll give you more
Than any mortal eye has seen before.

এবং হাইনে : খাদ্য হলো মানুষের পবিত্র অধিকার।

ফলে ১৮৪৩ সালে মার্ক্স যখন On the Jewish Question-এ লেখেন : It is not only in the Peutatench & the Talmud, but also in contemporary society that finds the real nature of the Jew as he is today, not in the abstract but as a Jewish limitation upon society, তখনও কিন্তু আমরা সেই অউলানেমেরই স্বাদ পাই যে-অউলানেমের পরিচয় দিতে গিয়ে মার্ক্স তাঁর কাব্যনাট্যের চরিত্রলিপিতে লিখছেন, 'সেই জর্মন পান্থ'। ১৮৪৫-এ থিসিস অন ফয়েরবাখ-এ এই অউলানেমের কাব্যিক উচ্চারণই রাজনৈতিক প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়, আজ পর্যন্ত সব দার্শনিকই পৃথিবীর ব্যাখ্যাই করেছেন, প্রশ্ন হলো তার পরিবর্তন করা। এবং ১৮৩৭-এর অউলানেমের পান্থ-বোধ ১৮৬৭-তে ক্যাপিটাল গ্রন্থের ভূমিকার শেষে দান্তের উদ্ধৃতি হয়ে ঝরে পড়ে : Segui il tuo corso, e lascia dir le genti, যা খুশী বলুক লোকে, তোমার আপন পথে তুমি চলো।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ : যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে ,

এবং র‍্যাঁবো : ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে
আমরা পৌঁছবো আশ্চর্য নগরীতে

অথবা দান্তের ডিভাইন কমেডিতে বন্ধুদের কাছে ইউলিসিসের উক্তি :

Considerate la vostra semenza
Fatti non foste a viver come bruti
Ma per Seguir virtue e conoscenza

'নিজের উৎসের দিকে চেয়ে দেখো। বন্য জন্তুর মতো বেঁচে থাকার জন্য তুমি জন্মাওনি, তুমি জন্মেছ প্রগাঢ় জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির অধিকারে।' কারণ আমরা জানি, মার্কস ছিলেন জাতিতে ইহুদী। যখন তাঁর বয়েস আট তখন তার পিতা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত চাপে। জার্মানীতে ইহুদী সমস্যা ছিল দীর্ঘকাল ধরেই এবং এই অবস্থাতে বিশ্বের মানব সমাজেরই একটি খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ অংশ যে এক সময় 'সেই জর্মন পান্থ'-র চেহারায় উঠে আসেনা সেকথা জোর দিয়ে কে বলতে পারেন। একে আরও নানা ব্যাখ্যায় বিধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করেও বলা যায়, যৌবনের অউলানেম চরিত্র একদিন বিনা দ্বিধাতেই পৃথিবীর ব্যাপকতম অবহেলিত মানুষের ছায়ায় মিশে যায় এবং প্রমিথিউসের সঙ্গে তার ব্যবধান তখন থাকে খুব সামান্যই। যে প্রমিথিউস মার্ক্সের সব থেকে প্রিয় চরিত্র, যে-প্রমিথিউস সম্বন্ধে মার্ক্স তার গবেষণাপত্রে লিখছেন : Prometheus is the most eminent saint and martyr in the philosophical calender. কারণ ঈসকাইলাসের প্রমিথিউস বাউণ্ডে হেরমেজকে প্রমিথিউসের উত্তর :

Be sure of this, I would not change my State
Of evil fortune for your servitude.
Better to be the servant of rock
Than to be faithful boy to Father Zeus.

প্রসঙ্গত ১৮৪৭-এর জুলাইতে লেখা দ্য পোভার্টি অব ফিলসফিতে মার্ক্সের উচ্চারণ : Combat or death, bloody struggle or annihilation. এই হুঙ্কারের উৎস কিন্তু সেই অউলানেম, যেখানে তিনি প্রতিটি চরিত্রকে সাজিয়েছেন এক একটি অর্থের স্তম্ভের ওপর। যেমন Oulanem এসেছে

Manuelo শব্দের বর্ণ-বিপর্যয় থেকে, যার অর্থ ইমানুয়েল অর্থাৎ ঈশ্বর। লুসিন্দো এসেছে লুক্স অর্থাৎ আলো থেকে। আর পার্তিনি এসেছে পেরিয়ায়ে অর্থাৎ ধ্বংসের প্রতিরূপ হয়ে। ফলে অউলানেম হয়ে দাঁড়ায় এক বিচারক, যার হাতে ন্যায়দণ্ড, লুসিন্দো প্রতিভাত হয় বুদ্ধিদীপ্ত যৌবন হিসেবে এবং পার্তিনি তার বিবেকের কণ্ঠস্বর। এই তিন চরিত্রের ওপরেই আশ্চর্য ছায়াপাত করে গ্যয়টের ফাউস্ট এবং সম্ভবত সেই কারণেই ১৮৪৮-এর প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় যে-ইস্তাহার তার প্রথম লাইনটিতেই লেগে থাকে রক্তের ছাপ, a spectre is haunting the Europe, the spectre of communism. ফলে আমাদের আপত্তি করার মতো খুব একটা সুযোগ থাকে না যে অউলানেম, প্রমিথিউস এবং মেফিস্টোফিলিস —এই তিন মূর্তির পায়ের শব্দ ছড়িয়ে আছে মার্কস-জীবনের দীর্ঘতম সময়।

১৮৪৪-এ ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্টে মার্ক্স অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, টাকা হলো মানুষের প্রয়োজন এবং সেই বস্তুটিকে মিলিয়ে দেবার প্রধান সংগ্রাহক, একইভাবে তার জীবন ও জীবন পদ্ধতির। কিন্তু যে-জিনিসটা আমার জন্য আমার জীবনকে অর্থবহ করে সেটাই আবার আমার জন্য অন্যান্য মানুষের অস্তিত্বের রক্ষার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ আমার জন্য খেটে মরে অন্য লোক। এই জটিল তর্ককে মার্ক্স ছড়িয়ে দেন কাব্যে, গ্যয়টের মেফিস্টোফিলিসের মুখ দিয়ে মার্ক্স বলান :

What, man ! confound it, hands and feet
And head and backside, all are yours !
And what we take while life is sweet,
Is that to be declared not ones ?
Six Stallions, say, I can afford,
Is not their strength my property ?
I tear along, a sporting lord,
As if their legs belonged to me.

এবং পরমুহূর্তেই মার্ক্স আনেন শেক্সপীঅরকে টিমন অব এথেন্স থেকে

Gold ? Yellow, glittering, precious gold ? No, Gods,
I am no idle votarist !
Thus much of this will make black and white, foul fair,
Wrong right, base noble, old young, coward valiant.
...Why, this

Will lug your priests and servants from your sides,
Pluck stout men's pillows from below their heads :
This yellow slave
Will knit and break religions, bless and accursd ;
Make the hoar leprosy adored, place thieves
And give them title, knee and approbation
With senators on the bench : This is it
That makes the wappen'd widow wed again···

মার্ক্স শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোন, Shakespeare excellently depicits the real nature of money. এবং ১৮৪৭-এ দ্য জর্মন ইডিওলজি লিখতে গিয়ে বলেন, How little connection there is between money, the most general form of property, and personal peculiarity, how much they are directly opposed to each other was already known to Shakespeare better than to our theorising petty bourgeois. আসলে এটা মার্ক্সের কাব্যভাবনারই আরেক পরিচয়। যে-জটিল সামাজিক ব্যাধির সূত্রকে উন্মোচিত করতে গিয়ে শেক্সপীঅর অবলম্বন করেন কাব্যমূর্তিকা, মার্ক্স তারই সন্ধানে ব্রতী হয়ে কখনও অবলম্বন করেন শেক্সপীঅরের নাটকীয় অভিব্যক্তি, কখনও বা মেফিস্টোফিলিসের কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর নিয়েই ১৮৫২-র ৫ মার্চ যোসেফ ওয়েডেমেয়ারকে মার্ক্স একটি চিঠিতে লেখেন, আধুনিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিষ্কারে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এমন কি তাদের মধ্যেকার সংগ্রামের প্রশ্নেও নয়। কারণ দীর্ঘকাল আগেই বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা এই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসগত পরিবর্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এইসব শ্রেণীর অর্থনৈতিক চেহারা বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে আমি যা করেছি তা হলো প্রমাণ করা যে (১) এই সব শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর (২) শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবেই সর্বহারাদের একনায়কত্বের দিকে এগিয়ে চলে এবং (৩) এই একনায়কত্বই একদিন সমস্ত শ্রেণীকে ধ্বংস করে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করে। এরপর আমাদের আর স্বীকার করতে বাধা থাকে না যে সতেরো বছর বয়সে কবিতার যে-বীজ তরুণ কার্ল মার্ক্সের মনে প্রোথিত হয়েছিল কালক্রমে তা পরিণত হয় মহাকাব্যের স্বপ্নে, যে-মহাকাব্যে আছে সংগ্রাম। আরিস্টটলকে মার্ক্স মেনে নিয়েছেন যে সমস্ত মহাকাব্যেরই উৎস হলো যুদ্ধ, এবং

সমাজ বদলানোর এই প্রয়াস তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। অতঃপর রবার্ট পেইনের মতো আমাদেরও স্বীকার করতে আপত্তি থাকে না যে মার্ক্স একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হলো, আদ্যোপান্ত তিনি একজন নিখুঁত কবি।

নিখুঁত কবি না হলে কি করে মার্ক্স প্রবীন বয়সে, ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহের পরেও কন্যা এলিনর মার্ক্সকে এক চিঠিতে একথা বলেন যে, Inspite of everything we must forgive much to Christianity, for it has taught us to love children. আসলে যীশুর মধ্যে মার্ক্স মানবতাবাদের সেই রূপটিকেই খুঁজে পেয়েছিলেন যার মধ্যে আছে চূড়ান্ত স্বার্থহীনতা, যার মধ্যে আছে পবিত্রতার আমেজ। যীশু কী বলেন বা তাঁর মুখ দিয়ে কী বলানো হয়ে থাকে সে-প্রশ্ন অন্য। নিখুঁত কবি না হলে মার্ক্স সেইমুহূর্তেই সেই বিখ্যাত কথা কি করে বলেন যে, Religious suffering is at the same time an expression of the real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of an oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of a soulless state of affairs. It is the opium of the people. নিখুঁত কবি না হলে কি করে ১৮৫৯-এ সেই ঘটনা ঘটে যখন লাসালে তাঁর ট্রাজেডি ফ্রানৎজ ফন সিকিঙ্গেন পাঠিয়েছিলেন মার্ক্সকে তখন মার্ক্স উত্তর দিয়েছিলেন, গোটা ব্যাপারটাই ভালো করে ভাবা দরকার। আমার মনে হয় তোমার ধাঁচটা হওয়া উচিত শিলারিয়ান-এর পরিবর্তে শেক্সপীঅরিয়ান হওয়া। আমরা জানি, পাল্টা উত্তরে লাসালে তীব্র বিতর্ক তুলেছিলেন এবং Work of art-এর সঙ্গে Political document-এর এবং historical reality-র সঙ্গে aesthetic illusion-এর দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কের অনেক জটই খুলে গিয়েছিল সেদিন। এবং নিখুঁত কবি না হলে কি করে হাইনের 'জার্মানী : দ্য উইন্টার্স টেল'-এর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পাঠানো ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধের উত্তরে মার্ক্স বলেন, একদিন তো বসন্ত এসে যাবে! এবং আদ্যোপান্ত কবি না হলে কি করে ১৮৬৫-তে এক প্রশ্নের উত্তরে মার্ক্স বলেন, আমার প্রিয় গৌরব সাধারণ-সহজতা, পুরুষের মধ্যে দেখতে চাই শক্তির প্রাচুর্য, নারীর মধ্যে দুর্বলতা, আমার সব থেকে সুখ সংগ্রামে, দুঃখ ব্যর্থতায়-পরাজয়ে, আমার প্রিয় নায়ক স্পার্টাকাস ও কেপলার এবং সব থেকে যে-রঙ আমি ভালোবাসি তা হলো লাল।

তাহলে মার্ক্সের সাহিত্য-চর্চা নিয়ে এত অবহেলাভরা সমালোচনা ওঠে কেন? কেন ১৯২৯-এর পরেও দীর্ঘকাল তাঁর এই রচনাবলি জর্মনের খোলস ছেড়ে অন্য

দেশ অন্য কোনো ভাষার স্বাদ পায় নি? এমন কি বহু সমগ্রতেও-তার স্থান হয়নি কেন? এবং কিছু কিছু চেনা জানার পরেও তাঁর কবিতা, নাটক, উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর অনুগামীরাই বা কেন যথেষ্টভাবে মুখ খোলেন নি? এবং বার বার কেন কিছু বাজারী সমালোচকের হাতে এই যুক্তি তুলে দেওয়া হয় যে মার্ক্স কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছেন মাত্র এবং সেটা নেহাতই ছেলেমানুষী?

পিটার ডেমেৎজ মার্ক্সের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই ত্রুটি দুটি হলো, (১) Question of cultural lag এবং (২) Question of artistic insignificance. এবং পুরনো ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে আমরা এই তথ্যও পাচ্ছি যে ডয়েশার মুসেন-আলমানাখ পত্রিকার সম্পাদক আডালবেয়ার্ট চামিশোর কাছে একসময় মার্ক্স তাঁর কবিতা পাঠিয়েছিলেন ছাপানোর জন্য এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও সেটাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা। কিন্তু ডেমেৎজ উচ্চারিত দুটি প্রশ্নই এই প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ কি-না তা জানা যায়নি। তবে ডেমেৎজ-এর মন্তব্য নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

একথা সত্যি, মার্ক্সের কবিতার ধরন একটু অতিরিক্ত রকমের ছন্দবাদী এবং কিছুটা উদাসী, যে কারণে তাকে অনেকটাই সেকেলে বলে মনে হয়। এর কারণ সম্ভবত ঈসকাইলাস শেক্সপীঅর এবং গ্যয়টের প্রতি তাঁর বেশি মাত্রায় আনুগত্য এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া। একদিকে ঈসকাইলাসের দৈব-প্রবণতা, পাশাপাশি শেক্সপীঅরের সামাজিক কঠোরতা এবং তার বিন্যাস এবং অন্যদিকে গ্যয়টের প্রকৃতি-ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ মার্ক্সকে নানা পরস্পর বিরোধী ভাবনায় চিন্তিত করেছিল। যে-কারণে ১৮৩৫ সালেরই লেখা এযাবৎ অসংকলিত এক প্রবন্ধে মার্ক্সকে উচ্চারণ করতে দেখি: God speaks quietly, but surely. এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল য়েনীর প্রতি তার প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ, কবিতায় লেখেন: ভালোবাসা মানেই য়েনী, য়েনী মানেই ভালোবাসা। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এই সময়ে লাতিন এবং গ্রীক সাহিত্য পড়তে গিয়ে মার্ক্স মন্তব্য করেন a richness of ideas & a deep penetration into the subject. কবিতা সম্পর্কে আর একটু ছড়িয়ে বলা যায়, সাহিত্যের এই সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ ভিউ সম্পর্কে বাছবিচার মার্ক্স এই সময়েই করেছিলেন এবং ডেমেৎজ নিজেই আমাদের এই তথ্য দিচ্ছেন যে এই সময়ে মার্ক্স had translated the required passage from Sophocles' Women of Trachi quiet tolerably but added the critical comment that from line to line he had followed neither

the author nor the sense of the lines. এবং এই সময়েই মার্ক্স একই সঙ্গে ওভিদের ত্রিস্তিয়া, আরিস্টটল-এর রেটোরিক এবং তাসিতুস-এর গেরমানিয়া অনুবাদে হাত দেন। এই ধ্রুপদী মেজাজ মার্ক্সকে প্রাথমিকভাবে কিছুটা ছান্দিক করে তুলেছে এবং অবশ্যই কিছুটা উদাসী যা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধ্রুপদী শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে যে-কোনো শিল্পেরই কেন্দ্রে কোনো নায়িকা বা প্রেমের অনুভবকে দাঁড় করানোর যে-প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা আছে তাও মার্ক্সকে প্রভাবিত করেনি এমন কথা বলা যায়না। কিন্তু ডেমেৎজ-এর কথার খেই ধরে আমরা যদি একে কালচারাল ল্যাগ বলে চিহ্নিত করি তাহলে শুধু মার্ক্সের প্রতিই নয়, মানব সভ্যতার সাহিত্যধারার ইতিহাসের প্রতিও অবিচার করা হবে। ১৮৩৬-এর মার্ক্সের এই অনুভাবনাকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বসে আমরা যদি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে চিন্তার ভারসাম্যহীনতার (সমাজবিদ্যার ভাষায় একেই যদি বলা হয় কালচারাল ল্যাগ) এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করে সোচ্চার হই তাহলে ব্লেক-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ থেকে শুরু করে ফরাসী সাহিত্যের ভিক্তর উগো, রুশ সাহিত্যের পুশকিন, মার্কিন সাহিত্যের লংফেলো পর্যন্ত গোটা একটি যুগকেই পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে হয়। এমন কি এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড থেকে শিলার-হাইনে-গ্যয়টেও বাদ যাননা। য়েনীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম থেকেই মার্ক্সের এইসব কবিতার জন্ম হয়েছিল বলে যদি আমরা তাকে 'পশ্চাদপদ', 'অনাধুনিক' এবং অপ্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করি তাহলে ইওরোপীয় রেনেসাঁর প্রায় সমস্ত কবি, নাট্যকার এবং চিত্রশিল্পীকেই আমাদের এখন নির্বাসনে পাঠাতে হয়। এমনকি পুনর্মূল্যায়নের জন্য ফের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয় শেক্সপীঅরকেও।

আর ডেমেৎজ যাকে বলেছেন 'শিল্পগত তাৎপর্যহীনতা', তা এমনই আপেক্ষিক যে তার বিচারের দায় একমাত্র পাঠকের। কবিতার একমাত্র তন্নিষ্ঠ বিচারক তার পাঠকই এবং অবশ্যই কখনই কোনো সমালোচক ন'ন। কারণ **All poetry is in origin a social act, in which people & poet commune.** যে-কোনো কেতাবী সমালোচকের ভূমিকাই সেখানে অর্থহীন, অপাংক্তেয় এবং অবাঞ্ছিত। প্রয়োজনে একজন কবিই শুধু প্রগাঢ় আনন্দের মাঝে আকুল হয়ে কাঁদতে পারেন এবং তার জন্য কারোর কাছেই তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ন'ন। এ ব্যাপারে আর এগোবার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে পিটার ডেমেৎজ-এর অভিযোগ দুটি নিয়ে এখানে নাড়াচাড়া করার কারণ হলো একটাই যে ইদানীং কালের বুদ্ধিজীবীরা মার্ক্স-এর কাব্যচর্চা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডেমেৎজ-কথিত এই অভিযোগের বাইরে তৃতীয়

কোনো মৌলিক আক্রমণের সূচনা করতে পারেন নি। সে-বোধও সম্ভবত তাদের নেই।

আসলে মার্ক্সের সাহিত্য-ভাবনার মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আছে। কবিতায় যখন মার্ক্স আশ্চর্য খেয়ালী এবং উদাসী, মূলত চিত্রকর; তখন উপন্যাস, বা বলা যায় গদ্যে তিনি ঠিক ততটাই বিপরীতধর্মী ব্যঙ্গকার, প্রতিটি কথায় যার ঝরে পড়ে আক্রমণের সুরেলা ধারা। যেমন: 'খুব পরিষ্কার ভাবেই চাঁদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রশিলা, রমণীর বুকে মিথ্যার বীজ, সমুদ্রে রয়েছে বালি এবং পৃথিবীতে রয়েছে পর্বত।'

অথবা অন্যত্র :'আমি একেবারেই হতবুদ্ধি, যদি কোনো মেফিস্টোফিলিস আবির্ভূত হয় তবে আমি ফাউস্ট, যেহেতু আমরা জানি না কোন্‌টা ডানদিক অথবা কোন্‌টা বাঁদিক; আমাদের জীবন সেক্ষেত্রে এক সার্কাস, আমরা বৃত্তাকারে দৌড়চ্ছি, পাশ বা ধার খোঁজার চেষ্টা করছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত বালির ওপর পড়ে যাচ্ছি, আর সেই মত্ত দানব জীবন, সেই মুহূর্তে আমাদের হত্যা করছে।'

অথবা আরেক জায়গায়: 'এ সেই গ্রেথে, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, দারুণ ভয়ের স্বপ্ন, যেন সে ছিল ব্যাবিলনের এক প্রখ্যাত বেশ্যা, সেণ্ট জনের বাণী এবং ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং সুন্দর খাঁজ-কাটা চামড়ার ওপর যে তৈরী করেছে এক চমৎকার ফসল কেটে নেওয়া মাঠ, যাতে সেই রমণীর সৌন্দর্য কোনো অপরাধ বোধের জন্ম দিতে না পারে এবং যাতে সেই রমণীর যৌবন প্রতিরক্ষিত হয়।'

মার্ক্স তাঁর এই উপন্যাস 'স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স'-এর একটি উপ-নাম দিয়েছিলেন: **A Humourous Novel.** নির্দিষ্ট এই সংজ্ঞায় ভূষিত করার সম্ভাব্য কারণ বোধ হয় এটাই যে মার্ক্স বুঝেছিলেন, ব্যাপক অংশের পাঠক-পাঠিকার কাছেই তাঁর এই রচনা উদ্ভট এবং দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। এবং এটাকে সূত্র ধরে তাঁর চিন্তাসম্পর্কে কোনো কোনো মহলের সন্দেহ দেখা দেওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এই উপন্যাসের ছেঁড়া ছেঁড়া অংশ পড়ে আজ অন্তত আমরা বুঝতে পারি, যে ঈশ্বর, যে তথাকথিত পবিত্রতা সম্পর্কিত ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল ১৮৩৬-এর আকাশ, মার্ক্স তাকে সজোরে ভাঙছেন। এমন কি ভবিষ্যৎ দিনের অর্থনৈতিক আধিপত্যে মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন কি ভয়ঙ্কর রকমের ভঙ্গুর হয়ে উঠবে তার প্রতি সতর্কতার জাল ছুঁড়ে দিতেও মার্ক্স দ্বিধা করেননি। স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স আদ্যোপান্ত একটি প্রতীকি আখ্যান যার মূল বিষয় হলো মানুষ এবং মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং নিজস্ব সচেতন অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। মার্ক্সের কবিতা যে-অর্থে আবেগময়, নাটক বা উপন্যাস ঠিক সেই অর্থেই ক্ষিপ্ত এবং উদ্দাম। এই পরম্পরা

বিরোধিতার ছোট একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি কবিতায় মার্ক্স চিত্রিত করেছেন এক বীণাবাদককে যার শব্দের মূর্ছনায় দেখা দেয় মানসিক প্রলয়। তার প্রিয়তমা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এই সুর বাজানোর প্রয়োজন কি, বীণাবাদক তখন উত্তর দেয়, এর কোন উত্তর নেই, সে চায় হৃদয় রক্তাক্ত হোক, চূড়ান্ত ধ্বংস আসুক, জন্ম নিক নতুন হৃদয়। এখানে মার্ক্সের বিদ্রোহ অন্তর্মুখীন। একান্ত নিজস্ব। কিন্তু অউলানেমে তা পা বাড়িয়েছে। সেখানে তাঁর বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ জাগতিক। এই পরস্পর বিরোধিতা আছে বলেই মার্ক্সের সাহিত্যচর্চা এত বেশি তাৎপর্যময়। চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল মানুষের দ্বন্দ্ব এবং উত্তরণ থাকে বলেই হাইনরিখ হাইনের মতো কবি শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, আমার সমাধির ওপর তোমরা একটি খোলা তরোয়াল রেখে দিও, কারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রামে আমি ব্রতী হয়েছিলাম। রচনাশৈলী এবং ভাববিন্যাসে মার্ক্সের কবিতা যেমন আশ্চর্য উজ্জ্বল তেমনি চূড়ান্ত আধুনিকতা এবং সচেতন সমাজবোধের পরিচয় তাঁর উপন্যাস। আর নাটক অউলানেম? বিদ্রোহ ও বিপ্লবের তা প্রথম স্বরলিপি।

॥ তিন ॥

মার্ক্স যে একটি নাটক, একটি উপন্যাস এবং অজস্র কবিতা লিখেছেন এই তথ্য জানা যায় মার্ক্সের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে ১৯২৯ নাগাদ। তার আগে একটাই মাত্র খবর জানা ছিল, মার্ক্স দুটি কবিতা লিখেছেন। ১৮৪১-এ Athenaum পত্রিকায় প্রকাশিত এই দুটি কবিতাই বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হয়ে এসেছে, এমন কি ১৯২৯-এর বহু পরে পেঙ্গুইন থেকে যখন বুক অব স্যোসালিস্ট ভার্স প্রকাশিত হয় তখনও এই দুটি কবিতাই স্থান পায় তাতে, অন্য কিছু নয়। পরবর্তীকালে মস্কোর মার্ক্স-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট ডি রিয়াজানভের নেতৃত্বে ৪২খণ্ডে মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাবলী প্রকাশের যে পরিকল্পনা নেন তাতে এই সব রচনার কিছু অংশ স্থান পায়। কিন্তু ১২ খণ্ডের পর এই রচনাবলী আর প্রকাশ করা যায়নি। ইতিমধ্যে মার্ক্সের কাব্যনাট্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত Anteus কাগজে মুদ্রিত হয় এবং অন্যান্য কিছু সংকলনেও পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই ঘটনারও বেশ কিছুকাল পরে ১৯২৯ সালে লণ্ডনের লরেন্স উইশার্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী, নিউইয়র্কের ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স এবং মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স যৌথভাবে মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাবলী প্রকাশের যে-উদ্যোগ নেন তাতেই স্থান পায় এইসব রচনা, এমনকি ১৮৩৭-এ পিতার কাছে লেখা কার্ল মার্ক্সের একটি চিঠিও, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে মার্ক্সের

সমকালীন চিন্তাভাবনার যা সব থেকে স্পষ্ট চিহ্ন। পিতার কাছে লেখা মার্ক্সের অজস্র চিঠির মধ্যে মাত্র এই একটি চিঠিই অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে, আমাদের সকলের কাছেই যা এক মস্ত সম্পদ। ভাবতে অবাক লাগে ১৯৭৫-এর আগে পর্যন্ত একমাত্র জর্মনভাষীরা বাদে পৃথিবীর অন্যান্য সব ভাষাভাষীর মানুষই মার্ক্সের অধিকাংশ সাহিত্য রচনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বিশেষ করে তাঁর নাটক এবং উপন্যাস সম্পর্কে তো নয়ই।

পেঙ্গুইনে প্রকাশিত সর্বজন-পরিচিত দুটি কবিতাকে বাদ দিয়েও মার্ক্সের অন্য চারখানি কবিতা বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে এক্ষণ পত্রিকার কার্ল মার্ক্স বিশেষ সংখ্যায়। তারপরে এ সম্পর্কে আর কোনো কৌতূহল কোথাও দেখা যায়নি। মাঝখানে নাট্যকার বীরেন চক্রবর্তী অউলানেমের ভাষান্তর করেন নিজের মৌলিক রচনার সংযোজনে। কার্ল মার্ক্স সাহিত্য সমগ্রের এই কাজটি ধরা হ'য় ৭৪-৭৫ সাল নাগাদ বিশিষ্ট লোকায়ণবিদ অরুণকুমার রায়ের আন্তরিক উৎসাহে। এবং ৭৭ সালে একটি শারদ সংখ্যায় তার কিছু অংশ প্রকাশিতও হয়। কিন্তু গত পাঁচ বছরে অজস্র চেষ্টা সত্ত্বেও এই সংগ্রহকে প্রকাশ করা যায়নি। আজও হয়ত যেত না যদি সাংবাদিক বন্ধু পরিতোষ পাল এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার সিদ্ধার্থ ঘোষ এই উদ্যোগ না নিতেন এবং সুনীলবাবুর মতো একজন সজ্জন প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হতো। বাংলাভাষী মানুষের কাছে কার্ল মার্ক্সকেই হয়ত অপরিচিত হয়ে থাকতে হতো দীর্ঘকাল। তাতে মার্ক্সের নিশ্চয়ই কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু লজ্জা এবং গ্লানিতে ভেসে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প আমাদের কাছে থাকত না।

একজন দার্শনিকের সঙ্গে একজন বিজ্ঞানীর কাজের পদ্ধতিগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, একটা জায়গায় মিল এখানেই যে তারা দুজনেই কবি। কবি বলেই অমন আশ্চর্য ধৈর্য নিয়ে ফুলের মতো একটি একটি করে পাঁপড়ি খুলে তারা সত্যকে উন্মোচিত করেন। এবং আমরা জানি একজন কবি মানেই সেই যোদ্ধা, যার কাছে এই আকাশ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একই সঙ্গে নীলিমায় মিশে যাওয়া এক ব্যাপ্ত নিসর্গ এবং বুকের রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ। দানবের মতো এই বিশ্বকে ভেঙে চুরমার করার স্পর্দ্ধা এবং পরম মমতায় তাকে সোনালী রোদ্দুরে সিক্ত করার অধিকার শুধুমাত্র একজন কবিরই থাকতে পারে, আর কারো নয়। এমনই এক কবি কার্ল মার্ক্স। ১৪ মার্চ তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে এই সংকলনই হোক আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসার স্মরণচিহ্ন।

কাব্যনাট্য

অউলানেম

চরিত্রসমূহ

অউলানেম	সেই জর্মন পান্থ
লুসিন্দো	তাঁর বন্ধু
পার্তিনি	ইতালীর এক পার্বত্য শহরের এক অধিবাসী
আলোয়ান্দার	সেই শহরেরই আর এক নাগরিক;
বিয়েত্রিসে	তাঁর পালিতা কন্যা
পোর্তো	এক সাধু
এবং উইরিন	

নাটকের অন্তর্গত সমস্ত ঘটনাই পার্তিনি অথবা আলোয়ান্দারের বাড়ির ভেতরে অথবা বাইরে এবং পাহাড় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত।

'এ বুক অব ভার্স' নামে হাতে লেখা যে-বইটি মার্ক্স পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন সেই বইটিতে অউলানেম নাটকের এই অংশটি স্থান পায়। মার্ক্স নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন কি-না তা জানা যায়নি। দিলেও বাকি অংশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৮৩৭ সালের ১০-১১ নভেম্বর তারিখে পিতার কাছে লেখা চিঠিতে (এই গ্রন্থে সংকলিত) মার্ক্স এই বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। নাটকটির যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুই প্রকাশ করা হলো।

প্রথম অঙ্ক

এক পার্বত্য শহর

প্রথম দৃশ্য

পথ। অউলানেম এবং লুসিন্দো।
পার্তিনি তাঁর বাড়ির বাইরে।

পার্তিনি ॥ ভদ্রমহোদয়গণ। সারা শহর আজ বিদেশী
অতিথিতে ঝলমল, যশের প্রার্থনায় যাঁরা এসেছেন,
অবশ্যই আকর্ষণ ইপ্সিত বিস্ময়েব। সুতরাং
আমি জানাই আমন্ত্রণ আমাব এই ছোট্ট কুটিরে
যেহেতু কোনও পান্থনিবাসে পাবেন না এতটুকু ঠাঁই।
সামান্য সাধ্য আমাব, সেটুকু করতে পারলে তাই
আনন্দ অপার। বিশ্বাস করুন আমি চাই
বন্ধুত্ব আপনাদের, এ আমার তোষামোদ নয়।

অউলানেম ॥ আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, হে বিদেশী, যদিও
আমার ভয়, পাছে আমাদেব সম্পর্কে আপনার
কোন উচ্চ-ধারণা হয়।

পার্তিনি ॥ উত্তম, অতি উত্তম, এবার তাহলে সৌজন্য ত্যাগ করুন

অউলানেম ॥ কিন্তু আমরা যে মনস্থ করেছি বহুদিন এখানে থাকবার।

পার্তিনি ॥ যে আনন্দময় দিনকটি থাকবেন না এখানে
তাই আমার ক্ষতি, বঞ্চনা বেদনাময়।

অউলানেম ॥ আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার।

পার্তিনি ॥ (ভৃত্যকে ডেকে) শোন হে, এঁদের নিয়ে যাও
এনাদের ঘরে, দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত, দরকার তাই
বিশ্রামের, নিভৃতে থাকতে দিও, আর জেনো,
প্রয়োজন পোষাক পালটানও।

অউলানেম ॥ তাহলে একটু আসছি, ফিরে আসব এক্ষুনিই।

[অউলানেম এবং লুসিন্দো ভৃত্যের সঙ্গে যায়]

।র্তিনি ॥ (একাকী, সচেতনভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ শেষে)
এই সেই লোক, হে ঈশ্বর, এই সেই লোক। আবার
ফিরে এসেছে দিন ; সেই বন্ধু প্রাচীন, কখনও কি ভুলি

আমি, কখনই না, বিবেক আনে না বিস্মরণ। অপূর্ব!
আমার বুদ্ধির, বিবেকের বিনিময় করে দেবো, যাতে
সে-ও তা পেয়ে যায়, হ্যাঁ, অউলানেম। সুতরাং
বিবেক আমার, এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারে মন্থর।
তুমিই প্রত্যহ নিশীথে আমার শয্যা পাশে দণ্ডায়মান থেকো,
আমারই সঙ্গে তুমি নিদ্রা যাবে, জাগ্রত হবে আমারই সঙ্গে—
দুজনেই দুজনকে চিনি, আমার চোখ আছে নিবদ্ধ।
তার থেকেও বেশি জানি আমি, যেহেতু অন্যান্যদেরও এখানে অবস্থান
এবং তাঁরাও প্রত্যেকে অউলানেম, উপরন্তু অউলানেম।
এই নাম বেজে ওঠে মৃত্যুর মতো, প্রতিধ্বনি তুলে যায়
যতক্ষণ না শেষ সীমান্তকে কাছে পায়।
কিন্তু অপেক্ষা করো, আমি পেয়েছি! যেন পরিচ্ছন্ন বাতাসের মতো
আমার অভ্যন্তর থেকে উত্থিত হয়, যেন কঠিন করোটি।
আমার চোখের সামনে সঞ্চরমান তারই দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা—
আমি তা দেখেছি, আমি তাঁকেও দেখতে দেবো।
পরিকল্পনা প্রস্তুত আমার—অউলানেম, হ্যাঁ, তুমিই
তুমিই তার অসহায় নিঃসঙ্গ সত্তার নিগূঢ় গহন দেশ,
তার জীবন, তার প্রাণ।
তুমি কি নিয়তির হাতে পুতুলের মতো ধরা পড়বে?
স্বর্গকে বানাবে যন্ত্র তোমার হিসেবের?
দেবতারা সব দাঁড়াবে এসে তোমার কর্তিত মাংসকে ঘিরে?
তবে ক্ষুদ্র ঈশ্বর আমার, নিজস্ব অভিনয়ে এবার তুমি
আসীন হও; একটু থামো, কি যেন সংকেত আসে
আমারই জন্যে!

[লুসিন্দোর প্রবেশ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্তিনি এবং লুসিন্দো।

পার্তিনি ॥ বলো, কেন এত সঙ্গীহীন তুমি, হে যুবক আমার!

লুসিন্দো ॥ আগ্রহ, শুধু আগ্রহ। পুরনোর মধ্যে নেই কোন নতুনের আভাস

পার্তিনি ॥ অবশ্যই। কিন্তু তোমার বয়েসে!

লুসিন্দো ॥ না। কিন্তু এমন অবস্থা কখনও যদি ঘটে
আমার হৃদয় প্রসারিত হয় গভীর এবং প্রগাঢ় ইচ্ছায়
আমি তাঁকে পিতা নামে ডাকি, আমি হই তাঁর সন্তান,
যাঁর মানবিক এবং অনুত্থিত আত্মা পান করে বিশ্বচরাচর,
তেমন ব্যক্তির, যাঁর হৃদয়ের স্রোতে বিচ্ছুরিত হয়
উজ্জ্বল ঈশ্বর। তুমি কি তাকে চেনো না,
তবে কেমন ভাবে হতে পারে এমন একটি লোক
তাও তুমি ভাবতে পারবে না।

পার্তিনি ॥ সত্যিই অপূর্ব ধ্বনিময়, সুন্দর শব্দসম্ভার, নিঃসৃত
যেন উত্তাপময় যৌবনের ওষ্ঠ থেকে, প্রবীণের প্রশংসায়
আগুনের মতো উজ্জ্বল। এতই নৈতিক
যেন বাইবেল কথা বলে, যেন
দেম সুসান্নার কাহিনী, অথবা যেন সেই
হারানো ছেলের পুরনো আখ্যান।
কিন্তু একটা প্রশ্ন রাখতে পারি কি, কে সেই লোক
যার সাথে তুমি অনুভব করো নিবিড় বন্ধন?

লুসিন্দো ॥ অনুভব? শুধুই সাদৃশ্য—সাদৃশ্য এবং ভ্রান্তি?
আপনি কি মানুষ বিদ্বেষী?

পার্তিনি ॥ সবশেষে, আমিও তো
মানুষ।

লুসিন্দো ॥ মার্জনা করবেন, যদি কোন রূঢ়কথা বলে থাকি।
আপনার হৃদয় আশ্চর্য সৌহার্দ্যময় বিদেশীর প্রতি,
এবং যেই আসুক না কেন মৈত্রীর সম্পর্কে
আত্মা কখনো হয় না আবদ্ধ।

তবুও আপনি উত্তর চেয়েছেন। উত্তর আপনি পাবেন।
অত্যন্ত হালকা মৈত্রীসূত্র আমাদের হৃদয়কে গভীর ভাবে
করেছে বন্ধন যেন প্রত্যন্ত প্রদেশে এক অগ্নিকুণ্ড
জ্বলে সারাক্ষণ, বিচ্ছুরিত হয় অগ্নিচ্ছটা
যেন আলোকের পিশাচেরা বেছে নেয়
সূক্ষ্ম চিন্তার সুর একটা থেকে আর একটা।
আমি তাকে চিনি বহুদিন, দীর্ঘ—দীর্ঘদিন,
স্মৃতি উচ্চারিত হয় সন্তর্পণে, মনে নেই, কিছু নেই মনে
কেমন ভাবে সাক্ষাত ঘটেছিল আমাদের দুজনে।

পার্তিনি ॥ অদ্ভুত রোমাঞ্চময়।
তবু বলি, হে সুপ্রিয় যুবক, এ-যে কেবলই উচ্ছ্বাস
নয় যে উত্তর অনুরোধের আমার।

লুসিন্দো ॥ আমি শপথ করে বলছি।

পার্তিনি ॥ শপথ করে? কি বলছেন আপনি?

লুসিন্দো ॥ আমি তাকে চিনি না, যদিও অবশ্যই ভালো করে জানি।
তাঁর বক্ষগহ্বরে সঞ্চিত আছে রহস্য
যা আমি জানতে পারি না—এখনও না—এখনও না…
এই শব্দ, এই কথা ধ্বনিত হয় প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে,
অথচ দেখুন, আমি নিজেকেই চিনি না এখনও!

পার্তিনি ॥ তা' তো ভালো নয়।

লুসিন্দো ॥ সেইজন্যেই এত বিচ্ছিন্ন, এত বেশি নির্জনে থাকি।
একজন দরিদ্রও গর্ব করে বলতে পারে, সামান্য হেসে
কেমন করে সে মানুষ হয়েছে, কে তাকে করেছে লালন
পরিতৃপ্তি সহকারে, ছোট ছোট ঘটনা সাজিয়ে রাখে
মনের গভীরে। আমি তো তা পারি না।
লোকে আমাকে লুসিন্দো বলে ডাকে, অথবা
এমনও তো বলতে পারে ফাঁসিকাঠ অথবা গাছ।

পার্তিনি ॥ তাহলে আপনি কি চান? ফাঁসিকাঠের সঙ্গে বন্ধুত্ব?
অথবা কোন আত্মীয়তা? আমি হয়ত করতে পারি সাহায্য!

লুসিন্দো ॥ (সাগ্রহে) ফাঁকা শব্দসম্ভার নিয়ে খেলা করবেন না,
অন্তরে আমার গভীর প্রদাহ এখন।

পার্তিনি ॥ তবে আরো জ্বলুক, হে বন্ধু আমার
যতক্ষণ না নিজেই নিভে যায়।

লুসিন্দো ॥ (ক্রুদ্ধ ভাবে) আপনি কি বলতে চান ?

পার্তিনি ॥ কি বলতে চাই ? কিছুই না।
আমি এক নীরস গৃহবন্দী অশিক্ষিত লোক, আর কিছু নই,
যে শুধু প্রহরকে প্রহরই বলে থাকে,
যে প্রত্যহ রাত্রে ঘুমুতে যায়, এবং জাগে
যখন আবার সকাল হয়, শুধু প্রহরই গুণে যায়
নিজেকে হিসেবের বাইরে না ফেলা পর্যন্ত, যতক্ষণ না ঘড়ি থামে,
মৃত্তিকার কীট হয় সময়ের নির্দেশ ;
এবং এইভাবে চূড়ান্ত বিচারের দিন পর্যন্ত
যখন যীশু দেবদূত জেব্রাইলকে নিয়ে আমাদের
পাপের তালিকা থেকে একে একে তুলে ধরবেন শব্দ,
কেউ যান বাঁয়ে, অথবা কেউ ডাইনে,
এবং তাঁর বজ্রমুষ্টি খুঁজে ফিরবে আমাদের সমস্ত গোপন অঞ্চল
জানতে চাইবেন, আমরা প্রত্যেকে
এক একটি ভেড়া না নেকড়ে।

লুসিন্দো ॥ আমায় তিনি ডাকবেন না, আমার তো কোন নাম নেই।

পার্তিনি ॥ ভালোই বলেছেন, তাহলে আমি আপনার কথাই শুনবো !
কিন্তু দেখুন, এখনো আমি এক গৃহবন্দী অশিক্ষিত লোক
আমার চিন্তা শুধু নীড়েই আবদ্ধ, আমি তাকে নিয়ে ফিরি
যেমন আপনি খেলা করেন বালি আর পাথর নিয়ে।
অতএব আমার মনে হয়, যে-লোক নিজেই জানে না
তার উৎস, বিপরীত নিয়ে চলে—তার অবস্থান
অন্য কোন পৃষ্ঠে, বিভ্রমের দৃষ্টিপথে।

লুসিন্দো ॥ তার পরিচয় কি ?
ভেবে দেখুন একবার, সূর্যটা যদি কালো হয়
চাঁদ বৈচিত্র্যহীন সমতলভূমি, যদি কেউ না পাঠায়

আলোর ছটা, তবুও যেন আওয়াজ আসে…
যেন কোন পূর্বপুরুষ, জীবনের স্পন্দন তাতে বাজে।

পার্তিনি ॥ বন্ধু আমার, নিজেকে এত উদ্দাম করে তুলবেন না।
বিশ্বাস করুন, আমি কোন স্নায়ুরোগেও ভুগছি না!
কিন্তু সেই বিভ্রম শুধুই সবুজ, যেন শেওলায় ভরা,
হ্যাঁ, তাঁরা উন্নত করে গতিপথ অতুল বৈভবে
ছুটে যায় দীপ্ত কণিকার মতো স্বর্গের পথে,
যেন জানে কি অপার আনন্দে তাঁরা প্রস্ফুটিত,
কোনও মূর্খতা কোনও ঘৃণ্য দাসত্বই তাদের করেনি অন্ধকার।
আর দেখুন, এইসব বিভ্রম শুধুমাত্রই ধাঁধা;
প্রকৃতি হলো কবি, বিবাহের অধিষ্ঠান অলঙ্কৃত আসনে।
মাথায় টোপর প'রে, সেই সঙ্গে বসন-ভূষণ,
ঘন গম্ভীর মুখ বিরক্ত হয়, মূর্খের মতো ভঙ্গুর,
এবং, তার পদতলে, পশুর চামড়ায় তৈরী কাগজে
পড়ে থাকে লিপি পুরোহিতের উগ্র অভিশাপে,
চিত্রিত গীর্জার প্রকোষ্ঠ, অন্তঃস্থ দেয়াল
কোন অলক্ষ্যস্থান হতে কম্পিত হয় ইতরের অট্টহাসিতে—
আমাকে বিদ্রূপ করে!

লুসিন্দো ॥ ঈশ্বরের দোহাই আপনার, অনেক বলেছেন!
কিন্তু ব্যাপারটা কি? ইচ্ছেটা কি আপনার, বলুন!
যদিও শাশ্বত সত্তায় আমারও কিছু বলার আছে।
আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি যদিও তা আমার কাছে
যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, কিন্তু সেটাই কি ব্যঙ্গের হাসি নয়?
মৃত্যুর আতঙ্কময় শব্দের মতো প্রতিধ্বনিত হয়
আমার দৃষ্টির সামনে, ঝড়ের সংকেতে যেন মাখে ভয়?
কিন্তু, ওহে পুরুষ, অত সহজে আপনি আমায় বিশ্বাস করেন নি,
বিলুপ্ত শয়তানের মূর্তি থেকে উত্থিত কি আপনি
যা আনে আমার অন্তরে জ্বলন্ত মশাল?
কিন্তু আপনি কখনই ভাববেন না, কোন এক মূর্খ বালকের সঙ্গে
এ আপনার একান্তই এক খেয়ালী খেলা, তীক্ষ্ণ অস্ত্রবানে.

যেন তার মস্তিষ্ক করে চূর্ণ। বড়োই দ্রুত এই খেলা খেলেছেন
সুতরাং এখন—আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন—
আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও খুব স্বল্প সময়ে
আপনি ঘনিষ্ঠ করেছেন নিজেকে, তবুও অন্তরের গভীরে
প্রবাহিত সরীসৃপের উষ্ণ স্রোত! অবিশ্বাস অথবা ঘৃণা
যাই করুন না কেন, আমি তা ফিরিয়ে দেব আপনার কণ্ঠস্বরে
আপনারই প্রদত্ত বিষ গ্রহণ করবেন আপনি নিজে,
আর তখনই আমি মত্ত হব ক্রীড়ায়।
কিন্তু বলুন, আপনি রাজী আছেন!"

পার্তিনি॥ আপনিই কি রাজী আছেন? নিশ্চয়ই ভাবছেন
ফাউস্ট অথবা মেফিস্টোফিলিস! আমি নিশ্চিত জানি
আপনি এখন তাঁদের গভীরে নিহিত। কিন্তু আমি বলি,
আপনার ইচ্ছাকে নিজেরই মধ্যে সন্নিবদ্ধ করুন।
আমি সেই মূর্খ দৃষ্টি ধুলোয় করব আচ্ছন্ন।

লুসিন্দো॥ সতর্ক হোন। জ্বলন্ত অঙ্গারে দেবেন না হাওয়ার উচ্ছ্বাস,
নিজেই দগ্ধ হবেন তার তীব্র শিখায়।

পার্তিনি॥ বাঃ, কি সুন্দর কথা, কোনই বক্তব্য নেই তার জানি
যদি কেউ দগ্ধ হয় সে শুধু আপনি।

লুসিন্দো॥ আমি? আমি হতে পারি? আমার কাছে আমিই কিছু নই!
কিন্তু আপনাকে, আপনাকে আমার এই যৌবনদৃপ্ত বাহুদ্বয়
ঘিরে ধরে করতে পারে নিষ্পিষ্ট। তখন থাকে অপেক্ষায়
আমাদের দুজনের জন্য কোন এক ঘন অন্ধকার পৃথিবী,
যদি আপনি ডুবে যান তাতে, আমি হবো সাথী,
মৃদু হেসে চুপিসারে বলব, আমি আছি বন্ধু, আমিও আছি।

পার্তিনি॥ মনে হচ্ছে কল্পনার আশীর্বাদে আপনি আশ্চর্য মহীয়ান।
অনেক কি স্বপ্ন দেখেছেন আপনি, আপনার এই জীবন?

লুসিন্দো॥ হ্যাঁ তাই, অনেক স্বপ্নকে পেয়েছি আমি,
কি শিখব আপনার কাছে, রিক্ত যিনি, যার নেই
কোনও সঞ্চয়, আপনি দেখেছেন আমাদের কিন্তু চিনতেই
পারেন নি। ফলে অপমান এবং ব্যঙ্গের তীব্রচ্ছটায়

ধ্বনিত। কিসের জন্য অপেক্ষা আমার? আরও আপনার জন্য?
আমার কাছ থেকে কিছুই পাননি আপনি, যদিও
আপনার থেকে অনেক নেওয়ার আছে আমার।
আমার জন্যে আছে অন্যায়, বিষ, লজ্জা; উদ্ধার
করতে হবে আপনাকে। আপনিই এঁকেছেন সেই বৃত্ত
যা আমাদের দুজনকেই আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করেছে।
তাহলে এখন আপনি আপনার পলায়নী চাতুর্য
প্রদর্শন করুন। ভাগ্য আঁকতে চায়, তাই আঁকা হয়।
সুতরাং তাই হবে।

পার্তিনি ॥ বিয়োগ-বিষাদের বই থেকে আপনি শিখেছেন
শুধু শেষ, শুধুই করুণভাবে ফুরিয়ে যাওয়া।

লুসিন্দো ॥ কথাটা মিথ্যে নয়। আমরা বিষাদের অভিনয়ে আচ্ছন্ন।
অতএব আসুন, বিচার করুন, কোথায় কেমন করে
আপনি তা' চান, তাই হবে আপনার ইচ্ছে মতো।

পার্তিনি ॥ যখন সর্বত্র, এবং যে কোন সময় এবং কাউকেই না।

লুসিন্দো ॥ কাপুরুষ আপনি, মিথ্যেই বিদ্রূপ করছেন আমার কথায়,
নতুবা ভীরুতার ছাপ আমি এঁকে দেবো আপনার মুখাবয়বে
চীৎকার করে জানাব তা পথে এবং প্রান্তরে, জনতার মাঝে
ছুঁড়ে দেবো আপনাকে, যদি আপনি কথা না শোনেন,
যদি আপনি ক্রমাগতই বানিয়ে যান একটার পর একটা জঘন্য
ঠাট্টার সুর, যখন আমার শিরায় প্রবাহিত হয়
শীতল রক্তের স্রোত। আর একটিও কথা নয়।
শুনুন আর নাই শুনুন, কাপুরুষ আর মতলববাজ আপনি,
আপনার শাস্তি অবশ্যই ঘোষিত।

পার্তিনি ॥ (আবেগ নিয়ে) আবার বলুন, আবারো শুনি একবার।

লুসিন্দো ॥ নিশ্চয়ই, যদি খুশী করে আপনাকে, তবে আমি হাজারবার বলব।
যদি আপনাকে বিদ্ধ করে, জ্বালা ধরায়, চোখ থেকে
রক্ত ফেটে পড়ে, তবে আবারো বলব আমি
শুধু একটি কাপুরুষ আর মতলববাজ আপনি।

পার্তিনি ॥ আমাদের ভাবতে হবে। আপনিও ভালো করে
মস্তিষ্কে গ্রথিত করুন। আমাদের এখন একটিই মাত্র জায়গা আছে
যার নাম নরক—যদিও আমার নয়, একান্তই আপনার।

লুসিন্দো ॥ কেন এই শব্দের গণনা, যদি তাঁর নিষ্পত্তি এখানেই
ঘটে যেতে পারে। তাহলে চলে যান নরকেই,
শয়তানকে বলবেন আমিই পাঠিয়েছি আপনাকে।

পার্তিনি ॥ আর কিছু কথা বলুন।

লুসিন্দো ॥ তারই বা কি দরকার ? আমি কথা শুনতে পাই না।
বাতাসে বুদ্বুদ ফাটে, কথার সাযুজ্যে আপনার মুখে
ছায়া পড়ে, আমি তাও দেখতে পাই না।
বরং অস্ত্র আনুন, তাদের শব্দিত হতে বলুন,
আমি আমার হৃৎপিণ্ড সঁপে দেবো তাদের,
এবং যদি না তা বিদ্ধ হয়, তখন—

পার্তিনি ॥ (তাকে থামিয়ে) এত দৃপ্তস্বরে নয়, হে বালক, নয় এত অনভিজ্ঞতায়।
হারাবার কিছুই নেই আপনার।
চন্দ্রচ্যুত এক শিলাখণ্ড আপনি, যার ওপর
যেন কেউ কোনদিন লিখেছিল একটি শব্দ একান্তই অন্যমনস্কতায়।
আপনিও পড়েছেন সেই শব্দ, তাঁরা চীৎকার করেছে : লুসিন্দো !
কিন্তু জানবেন, শূন্য সেই ধ্বনিতে আমি বাজি ধরব না কিছুতেই
আমার জীবন, আমার সম্মান, নিজেকে, কোন কিছুই।
আমার রক্ত দিয়ে আপনি ছবি আঁকতে চান ?
আপনি চান আমি তুলি হয়ে যাই যার টানে স্পষ্ট হয় ছবি ?
পথ এবং অবস্থানে আমরা বহুদূর চলে গেছি।
আমি কি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব, যেমন দাঁড়িয়ে আপনি ?
আমি জানি আমার পরিচয়। কিন্তু আপনি বলুনতো, কে আপনি ?
আপনি নিজেই জানেন না তা, তাই কিছুই হারাবার নেই ভয় !
চোরের মত তাই কিছু সম্মান জমা রাখতে চাইছেন
আমার কাছে, যার নেই কোন উজ্জ্বল পরিচয়
আপনার জারজ-বক্ষে। তাই করছেন
এদিক ওদিক, আমার বিত্তের বিরুদ্ধে আপনার দেউলিয়াপনা,

তাই না বন্ধু ? অতএব প্রথমে প্রতিষ্ঠা করুন গরিমা,
নাম, সম্মান এবং জীবন ; এখনো নন আপনি কিছুই
যেটুকু আমার আছে, আপনার বিরুদ্ধে রই।

লুসিন্দো ॥ তাই নাকি, হে কাপুরুষ ! এভাবেই তাহলে আত্মরক্ষা
করতে চান ? নিখুঁত গণনা আপনার, যদিও মূর্খতা
আছে ঘিরে সমগ্র মস্তিষ্ক। নিজেকে ছলনা করবেন না।
আমি মুছে দেবো আপনার উত্তর।
পরিবর্তে সেই স্থানে লিখব কাপুরুষতার প্রতিবিম্ব।
মাতাল পশুর মতো আমি আপনাকে ঘৃণা করি,
আপনাকে আমি ধিক্কার দিই, সমস্ত জগতকে কাছে ডেকে
এবং তখনই আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, পূর্ণ বিবরণে,
আপনার আত্মীয়স্বজন, পুত্র-কন্যা, প্রত্যেকে সবার কাছে,
আমি নিজেকে লুসিন্দো বলে ডাকি, হ্যাঁ, লুসিন্দো,
এটাই আমার নাম, অন্য কিছুও হতে পারতো,
এরই সঙ্গে সখ্য আমার, যদিও প্রভেদও থাকতো দুস্তর।
মানুষ যাকে মানুষ বলে ভাবে, আমার কিছুই নেই তার ;
কিন্তু আপনি শুধু আপনিই, কাপুরুষতার ইস্তাহার।

পার্তিনি ॥ অতি উত্তম, ভারী চমৎকার। কিন্তু মনে করুন
আমি আপনাকে একটা নাম দিলাম, একটা নাম—শুনতে পাচ্ছেন ?

লুসিন্দো ॥ আপনার নিজেরই নেই কোন নাম, অথচ আপনিই করবেন নামকরণ ?
আপনি সবেমাত্র চিনলেন আমায়, ইতিপূর্বে দেখেনও নি কোনদিন।
আর যা দেখেছেন তা শুধুই মিথ্যা, শুধুই শাশ্বত ফাঁকি
আমাদের আহত করে, বিদ্ধ করে পতন, আমরা শুধু দেখি।

পার্তিনি ॥ ভালই বলেছেন। কিন্তু দেখা ছাড়া আর
কে কবে বেশি বুঝেছে ?

লুসিন্দো ॥ সবাই, আপনি বাদে। প্রত্যেকটি জিনিসে প্রত্যক্ষ
করেছেন নিজেকেই, যেন পলাতক এক দুর্বৃত্ত।

পার্তিনি ॥ সত্যি কথা। আমি সহজে প্রতারিত হইনা
প্রথম দর্শনেই। কিন্তু সেই ভদ্রলোক—তিনি তো আর
গতকালই জন্মগ্রহণ করেননি। বিশ্বাস করুন,

তিনি তো দেখেছেন একাধিক। যদি আমরা চিনে থাকি
পরস্পরকে, তবে কি আসে যায় ?

লুসিন্দো ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

পার্তিনি ॥ কিন্তু এমন কি কোন আশ্চর্য কবি নেই,
আকাশ অন্ধকার করা ম্লান কোন সৌন্দর্যবিদ,
প্রগাঢ় মগ্নতায় যিনি ডুবে থাকেন প্রহরের পর প্রহর,
যিনি জীবনের স্বরলিপিতে একের পর এক গাঁথেন সুর,
খুশী মনে লিখে যান কবিতা, নিজেরই জীবনের ?

লুসিন্দো ॥ হায়রে, এমনও সুযোগ হতে পারে !
আপনি কিন্তু প্রবঞ্চনা করবেন না আমায়।

পার্তিনি ॥ সুযোগ ! এ হোল দার্শনিকের কথা, আত্মরক্ষার পথ
যখন কোন যুক্তিই পারে না তাঁকে বাঁচাতে।
সুযোগ—কথাটা এত সহজে বলা যায়—শুধু একটিই মাত্র কথা,
সুযোগও একটা নাম। যে-কোন লোকেরই নাম হতে পারে
অউলানেম, যদি তার অন্য কোন নাম না থাকে।
সুতরাং আমিও তাঁকে তো বলতে পারি, যেন এক নিখুঁত সুযোগ।

লুসিন্দো ॥ আপনি চেনেন তাকে ? স্বর্গের দোহাই, বলুন একবার—

পার্তিনি ॥ অজ্ঞানতার পারিশ্রমিক কি জানেন ? তার নাম নীরবতা।

লুসিন্দো ॥ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনায় আমি বিষণ্ণ বোধ করি,
কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি, যা আপনি চান !

পার্তিনি ॥ যা চাই আমি ! আপনি কি মনে করেন এ এক নেহাতই
দর কষাকষি ? আপনি তো জানেন কোন কাপুরুষেরই
নেই কোন অধিকার সামান্যতম প্রতিজ্ঞায় ?

লুসিন্দো ॥ তাহলেও বলুন, ভীরুতার অপবাদ যদি আপনাকে বিদ্ধ
করে, তবে মুক্ত হোন, মুক্ত হয়েই বলুন।

পার্তিনি ॥ তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আমাকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে
যেমন হয়েছেন আপনি। প্রতিযোগী হিসেবে উত্তম।
অতএব আসুন, দ্বন্দ্বে আহ্বান করি।

লুসিন্দো ॥ আমাকে সেই সীমান্তে পাঠিয়ে দেবেন না, দৃষ্টিরেখার বাইরে,
যেখানে সব শেষ, সমস্ত অস্তিত্ব লুটিয়ে পড়ে।

পার্তিনি ॥ তবে শুনুন, বস্তুতপক্ষে আমরা চেষ্টা করি তাই।
ভাগ্য যা চায়, তাই হয়। সুতরাং চলুন আমরা যাই।

লুসিন্দো ॥ তাহলে? তাহলে বেরোবার কি কোন পথ নেই? আশা
নেই এতটুকু? তার বক্ষ ইস্পাতের মতো কঠিন, সমস্ত
অনুভব বিলীন, শুধুই যেন মরুময় অন্তহীন ঘৃণায়,
গরলে মিশ্রিত তারা অথচ প্রস্ফুটিত যেন সৌন্দর্যের ভাবনায়।
এবং সে হাসে। এই কিন্তু আপনার শেষ হাসি,
ভালো করে হেসে নিন, হে ভদ্রমহোদয়, কিছু সময় বাকি
তারপরেই উপস্থিত হবেন বিচারকের সম্মুখে।
শিথিল হয়ে আসবে জীবনের সমস্ত শৃঙ্খল, একটি শব্দে,
যে শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায় হালকা স্বরে
জীবনের শেষ উচ্চারণে।

পার্তিনি ॥ প্রিয় বন্ধু আমার, সে ও তো আরেক সুযোগেরই নাম,
বিশ্বাস করুন, আমি নিজেও বিশ্বাস করি সুযোগকে।

লুসিন্দো ॥ সব বাজে কথা! থামুন—বন্ধ করুন—এই সব বাজে কথা,
ঈশ্বরও জানেন, এইভাবে সম্ভব নয় কোন উত্তর পাওয়া।
আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবারও প্রতারণা করল আপনাকে।
আমি তাঁকে আমার সামনে সোজা হয়ে বলব দাঁড়াতে।
তখনই আপনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেন
মুখের দিকে মুখ রেখে, চোখেতে চোখ, যেন
কোন ক্ষুদ্র বালক ধরা পড়ে গেছে কোন ভুলের কাছে।
আপনি আমাকে কখনই ধরে রাখতে পারেন না
আমাকে চলে যেতেই হবে।

(তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায়)

পার্তিনি ॥ আরেকটি ব্যাপক পরিকল্পনা আপনাকে
সাহায্য করবে, বিশ্বাস করুন, পার্তিনি কখনই একে
ভুলে যাবে না।
(চীৎকার করে ডাকে) লুসিন্দো, শুনুন, শুনুন,

ঈশ্বরের দোহাই, একবার ফিরে আসুন।

(লুসিন্দো ফিরে আসে)

লুসিন্দো ॥ কি বলতে চান আপনি? যেতে দিন আমায়!

পার্তিনি ॥ আপনার জন্য রয়েছে সম্মান।
যান, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের গিয়ে জানান
আমরা পরস্পর কলহ করেছি, আপনি আহ্বান জানিয়েছিলেন
প্রতিদ্বন্দ্বিতার, কিন্তু অত্যন্ত সুশীল বালকের মতো,
পবিত্র শিশুর মতো অনুতপ্তের ভঙ্গীতে চেয়েছেন ক্ষমা,
এবং প্রত্যুত্তরে আমি ক্ষমা করেছি। পবিত্র অশ্রুধারা
বেয়ে পড়ে, হাতের ওপর চিহ্নিত হয় চুম্বনের ছাপ
বিসর্জিত হয় ক্রুদ্ধ প্রতিশোধের হুঙ্কার।

লুসিন্দো ॥ আপনিই আমাকে বাধ্য করলেন।

পার্তিনি ॥ আপনি নিজেই বাধ্য হয়েছেন। এই শব্দ ধ্বনিত হয়
শিশুকাহিনীব নৈতিকতাব মতো। আপনি
কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

লুসিন্দো ॥ স্বীকাবোক্তি? আপনার কাছে?

পার্তিনি ॥ আপনিও কি চাননি আমিও রাখি
এমনই এক স্বীকারোক্তি, আপনারই কাছে?
হ্যাঁ, আমি রাখব। কিন্তু আগে বলুন, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে?

লুসিন্দো ॥ তাতে আপনার কি আসে যায়।

পার্তিনি ॥ শুধুই সাদামাটাভাবে জানানো ইচ্ছে নয়,
তাই আপনারই মুখ থেকে সহজভাবে চিনতে চাই।

লুসিন্দো ॥ আমি বিশ্বাস করি না সেইভাবে যেভাবে চেনে
সাধারণ মানুষ বিশ্বাসকে। বরং ঢের চিনি তাকে
যতটুকু জেনেছি নিজেকে।

পার্তিনি ॥ যখন সময় হবে যোগ্য মানসিকতায়, তখনই বলব
তার কথা। যেভাবেই বিশ্বাস করুন না কেন আপনি
আমার কাছে তা সবই সমান। কারণ বিশ্বাসই সব।
বিশ্বাসই শেষ কথা। সুতরাং তার নামে শপথ করুন।

লুসিন্দো ॥ কি বললেন, শপথ করবো ? আপনার কাছে ?

পার্তিনি ॥ হ্যাঁ শপথ, যাতে সময়ের ব্যবধানে একটিও শব্দের সঙ্গে
আপনার জিব বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে।

লুসিন্দো ॥ তাই আমি প্রতিজ্ঞা করব, হে ঈশ্বর !

পার্তিনি ॥ শপথ করুন তাহলে, আমার সঙ্গে থাকবে আপনার
দীর্ঘকালীন সখ্য। দেখুন, আমি ঠিক ততটা
খারাপ নই, শুধু সোজাসুজি কথা বলি—এই যা।

লুসিন্দো ॥ ঈশ্বরের নামে আমি কখনই একথা শপথ করব না
যে আপনাকে আমি ভালোবাসি, অথবা আপনিই আমার
একান্ত প্রিয় ; কখনই সম্ভব নয় তা, কিন্তু বহিষ্কার
করা দরকার যা কিছু পুরনো, যা কিছু অতীত,
যেন বিবশ দুঃস্বপ্ন। সমস্ত স্বপ্ন যেখানে হয়
উধাও, বিস্মৃতির উচ্চকিত কলরোল, আমি সেখানেই
তাকে বিসর্জন দিলাম। অমর পবিত্র সেই
সত্বার নামে আমি শুধু আপনার কাছে এই
প্রতিজ্ঞাই করতে পারি, যার থেকে এই পৃথিবী
অনন্ত শূন্যের মাঝে ঘূর্ণীর মতো উত্থিত, যিনি
মুহূর্তের ঝলক থেকে জন্ম দেন শাশ্বতের অধিকার,
আমি তারই নামে শপথ করি। কিন্তু আমার পুরস্কার ?

পার্তিনি ॥ আসুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো এক শান্ত পরিবেশে,
দেখার অনেক দৃশ্য, দুর্গম গিরিসঙ্কটে
অগ্নিহোত্রী পৃথিবী থেকে উত্থিত কি অপূর্ব হ্রদ,
যেখানে সময় হালকা হাওয়ার মতো নিয়ে যায় অনেক পেছনে
যেন নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশ, তখন ঝড়ের বুকে
দোলা লাগে, চোখে নামে তন্দ্রা, এবং তখনই—

লুসিন্দো ॥ তাই কি ? আপনি তো বলছেন পাথর, খাদ, কাদা
এবং কীটপতঙ্গের কথা ! কিন্তু পাহাড় এবং জলগর্ভ
শৈলশ্রেণী তো সর্বত্রই, প্রতিটি স্থানেই প্রবাহিত হয়
উষ্ণ প্রস্রবন, কোথাও বা তীব্র স্রোত।
কিন্তু তাতেই বা কি আসে যায় ! সেই আশ্চর্যময়

জায়গা এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে আমরা
প্রত্যেকেই বন্দী, রুদ্ধবাক্। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে
আমার বুকে সঞ্চিত হয় উত্তেজনার ঝড়,
ক্ষুব্ধ রোষে যদি তার বিস্ফোরণ ঘটে তবে তা
নেহাতই কৌতুক, তার বেশি কিছু নয়।
সুতরাং আমাকে আপনি নিয়ে চলুন সেই স্থানে,
যেখানে আপনি যেতে চান, শুধু
ভাবনাহীনভাবে গ্রহণ করুন আমাকে।

পার্তিনি ॥ প্রথমে ধ্বনিত হোক বজ্র, বিদ্যুতের শিরায় শিরায়
আলোকিত হোক আপনার বক্ষ। তারপর সেই জায়গায়
আমি আপনাকে নিয়ে যাবো, আমার ভয়,
সেখানেই হয়ত আপনি থাকতে চাইবেন দীর্ঘকাল।

লুসিন্দো ॥ যেখানেই হোক, যেখানেই লক্ষ্য থাকুক আপনার
আমি হবো সঙ্গী, আপনি পথপ্রদর্শক আমার।

পার্তিনি ॥ অবিশ্বাস্য!

[তাঁরা দুজনেই চলে গেলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

পার্তিনির বাড়ির একখানা ঘর। অউলানেম একা, টেবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু একটা লিখছে। কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সহসা সে উঠে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক পায়চারী করে হঠাতই থমকে যায় যেন, তারপর বুকের ওপর দুহাত আবদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

অউলানেম ॥ সব কিছু ধ্বংস হলো। আমার সময় শেষ, যদিও
শাশ্বত সময় দাঁড়িয়ে আছে শুধু। ক্ষুদ্রকায় বিশ্বও
এখন স্তব্ধতায় বিসর্জিত! শীঘ্রই চিরন্তনকে আমি করবো আলিঙ্গন
এবং মনুষ্যত্বের দানবীয় অভিশাপ শোনাব তাকে তখন।
চিরন্তনী! সে এক শাশ্বত যন্ত্রণা,
অপরিমিত মৃত্যু, অবর্ণনীয় নির্বাসন।
এক বিষাক্ত তীর অপেক্ষায় থাকে আমাদের বিদ্ধ করার জন্য।

আমরা, যারা দেয়ালঘড়ির মতো এক যন্ত্র যার তুচোখ অন্ধ,
শুধুই ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো সময়কে বয়ে নিয়ে যায়,
শুধুই ঘটে সেইটুকু যা ঘটার, আশ্চর্য রোমাঞ্চহীনতায়
এবং তারপর শেষ, নিশ্চিত ধ্বংস থাকে তারপর।
পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল আরও একটি জিনিসের—
মৌনতা, রুদ্ধবাক হিংসা ক্রমেই উত্থিত হয় বৃত্তের মতো।
মৃত্যু আসে জীবনের কাছে চুপিচুপি, গ্রহণ করে সেইসব যতো
ছিল তার, যা কিছু ; লতার বিষণ্ণতা, পাথরের ভাষা,
পাখীরা খুঁজেই পায় না তাঁদের তুঃখ জানাবার মতো কোন গান,
মতভেদ এবং অন্ধ উন্মাদনা নিয়ে আসে কলহের বীজ,
পরস্পর ধ্বংসের ইতিবৃত্তে—
তারপর সহসা যেন দাঁড়ায় উঠে
পায়ের ওপর ভর করে টানটান
প্রবাহিত হয় বক্ষের উষ্ণ শোণিতে
অনুভবের তীব্র দুর্গচূড়ায় জীবনের নিগূঢ় অভিশাপ !
হাঃ হাঃ, সুতরাং আমি নিজেকে মুক্ত করি অগ্নির তুর্মর পাখায়
নিজেকে গ্রথিত করি সময়ের কালবৃত্তে, উন্মাদ নৃত্যের চাকায়।
যদি তারও পাশে থাকে কিছু, আমি ছুঁড়ে দিই তার দিকে আমার সত্তা।
যদিও সেই পৃথিবীকে আমি ধ্বংস করব, যার বিশাল শাখা
তুস্তর ব্যবধান রেখে যায় তার এবং আমার মধ্যে।
আমার দীর্ঘ অভিশাপে তা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে,
হিংস্রতাকে আমি গ্রহণ করি নিজের বাহুবন্ধনে
আমাকে আলিঙ্গন করে নিঃশব্দে তা প্রবাহিত হয়ে যায়।
প্রবাহিত হয় গভীরতম শূন্যতায়—
গভীর, গভীরতম—আহা, এই কি জীবন !
কিন্তু শাশ্বতের তীব্র স্রোতে যখন তা ভেসে যায়,
স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা রাখি নিরাময়ের, পরিত্রাণ,
কপালের কাছে বঙ্কিম হয়ে ওঠে ভ্রূ !
সূর্য কি পারে তার প্রজ্জ্বলন ? নিশ্চিতের কাছে অসহায় সমর্পণ,
অভিশাপের মূর্ত অঙ্গীকার ! তবে বিষাক্ত দৃষ্টি তখন
আসুক ধ্বংস, অন্ধ মৃত পৃথিবীতে আসুক রোমাঞ্চের শিহরণ।

আর আমরা, বন্দী চিরকাল, ছিন্নভিন্ন, নিমজ্জিত শূন্যতায়
বন্দী পাথরের প্রতিটি মিনারে.
বন্দী, বন্দী, বন্দী অনন্ত সময়ের পাখায় !
গ্রহরাজি শুধু নির্নিমেষে দেখে, গতিময় আপন কক্ষপথে;
সহসা চীৎকার করে অবলুপ্তির সঙ্গীতে ।
আর আমরা, শীতল নিথর ঈশ্বরের সন্তান সব, তীব্র আনন্দে
উল্লসিত হই এক বুক ভালোবাসার গভীরে বিষাক্ত বেদনায়,
এতই উষ্ণতা তার, সেই মূর্খ প্রেমের
দিগন্তব্যাপী সে শুধু ছড়ায়, শুধু ছড়ায়,
আর বহু উঁচু থেকে দেখে আমাদের ।
কানে কানে তখন শুধু শব্দ বাজে । অন্তহীন তরঙ্গ
যেন গর্জন করে, দূর থেকে দূরে, বহুদূরে ।
অতএব, খুব তাড়াতাড়ি, সমস্ত খেলা এখানেই শেষ,
প্রত্যেকেই প্রস্তুত, যে কবিতার জগৎ ছিল, তার রেশ
এখানেও ভেঙে চুরমার,
অভিশাপে শুরু যার, অভিশাপেই সমাপ্তি তার ।
(অউলানেম টেবিলের সামনে
আবার বসে এবং লিখতে থাকে) ।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

আলোয়ান্দারের বাড়ি । বাড়ির সামনের দিক ।
লুসিন্দো ও পার্তিনি ।

লুসিন্দো ॥ কেন এখানে নিয়ে এলেন আমায় !

পার্তিনি ॥ এক টুকরো নরম নারীমাংসের জন্য,
শুধু সেইজন্যেই । ভালো করে তাকান নিজের দিকে,
যদি সে এনে দেয় আপনার হৃদয়ে বসন্তের বাতাস
অগ্রসর হোন ধীরে ধীরে ।

লুসিন্দো ॥ সে-কি ! আপনি নিয়ে যাচ্ছেন আমায় বারবনিতার কাছে ?
এবং ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সমস্ত জীবন আমার

ঝাঁপিয়ে পড়ে বোঝাব মতন কাঁধের ওপর,
বক্ষ স্ফীত হয় দুর্বার অপ্রতিরোধ্যতায়,
ক্রুদ্ধ উন্মাদের মতো আত্ম-ধ্বংসে,
যখন প্রতিটি নিঃশ্বাস আমার ঘোষণা করে
হাজার হাজার মৃত্যুর ফরমান
তখনই কি-না একজন নারী !

পার্তিনি ॥ হাঃ—হাঃ, উত্থিত হোন হে যুবক পুরুষ ! নরকের আগুনকে গ্রহণ
করুন, গ্রহণ করুন ধ্বংসকে। কাকে বলে বারবণিতা ?
আমি কি ভুল বুঝেছি আপনার অর্থ ? দেখুন,
দেখুন, ওই এক মনোরম গৃহ। দেখে কি মনে হয়
কোন বারবিলাসিনীর প্রাসাদ ? আপনি কি ভাবছেন,
এক লাম্পট্যের খেলা খেলছি আমি আপনার সঙ্গে ?
আর কোন বাতিদানের মতো ছড়াচ্ছি দিনের আলো ?
তা নয়, তা নয়, হে বন্ধু আমার। প্রথমে
প্রবেশ করুন, এবং সম্ভবতঃ সেখানেই পাবেন
আপনার প্রত্যাশা মনোমতো।

লুসিন্দো ॥ আমি শুধু লক্ষ্য করছি আপনার চাতুর্য। আপনার
বাক্যের প্রাসাদ বড়োই সস্তা। সেই অবলম্বন, যার
সাথে আপনি গ্রথিত, নির্ভর একান্ত ভরে,
তাকেই আপনি পরিত্যাগ করতে চান। তবে
কৃতজ্ঞ থাকুন, এই কারণে, এই মুহূর্তে
আমি প্রতিশ্রুতি রাখব আপনার প্রতিটি কথার,
কিন্তু জানবেন, সাময়িকতাই আপনাকে আপনার জীবনের মূল্য দেবে।
(তাঁরা বাড়িটিতে প্রবেশ করেন। একটি পর্দা পড়ে গেল,
আরেকটি উঠল। একটি আধুনিক সুসজ্জিত ঘর।
বিয়েত্রিসে একটি সোফায় উপবিষ্ট। পাশে গীটার।
লুসিন্দো, পার্তিনি এবং বিয়েত্রিসে।)

পার্তিনি ॥ বিয়েত্রিসে, জনৈক পান্থ ইনি, নিয়ে এলাম তোমার
কাছে। দূর সম্পর্কে আত্মীয় আমার।

বিয়েত্রিসে ॥ (লুসিন্দোকে) অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন।

লুসিন্দো ॥ মার্জনা করবেন, যদি কোন যোগ্য শব্দ খুঁজে
না পাই আমি, আমার এই আশ্চর্য বিস্ময়ের প্রকাশে।
কদাচিৎ সৌন্দর্য এত তীব্র আবেগে মুগ্ধ করে আত্মা,
রক্ত চঞ্চল হয় তীব্র স্রোতে, তবুও শব্দ উচ্চারিত হয় না।

বিয়েত্রিসে ॥ আশ্চর্য সুন্দর কথা আপনার। মনও তার অনুকূল।
আপনার সুকুমার কথার জন্য অজস্র ধন্যবাদ, প্রকৃতির
সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত আমি ; অভিভূত হয়ে যাই
যখন আপনার অন্তর নয়, জিভ থেকে নিঃসৃত হয় শব্দরাজি

লুসিন্দো ॥ হায় রে, যদি আমার হৃদয় কথা বলতে পারতো,
উৎসারিত করতে পারতো যা আপনি সঞ্চিত করেছেন
আমার অন্তরের গভীরে, তাহলে আমার ভাষা যতো
সৃষ্টি করত উৎসাহের উত্তপ্ত ঐকতান,
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে জন্ম নিত চিরন্তন সময়,
এক স্বর্গ, এক অসীম অনন্ত সাম্রাজ্য
যেখানে প্রতিটি জীবন দীপ্ত হ'তো চিন্তার গভীর ব্যঞ্জনায়,
মিষ্টি কাহিনীতে, সুরধ্বনির মূর্চ্ছনায়,
পৃথিবীকে বুকের গভীরে রেখে
শুদ্ধ সৌন্দর্য বিস্তৃত হ'তো অপরিমিত প্রত্যয়ের স্রোতে।
আর ভেসে আসতো আপনারই অপূর্ব নাম
প্রত্যেকটি শব্দের রেখায়।

পার্তিনি ॥ এসব কথাকে তুমি অন্য কোন ভাবে গ্রহণ কোর না
সুন্দরী, কারণ ইনি একজন জর্মন, যিনি স্বতঃই
উৎসারিত হ'ন সুর, ছন্দ ও আত্মার ব্যঞ্জনায়।

বিয়েত্রিসে ॥ জর্মন ! খুবই আনন্দের কথা, যেহেতু আমারই
একান্ত পছন্দের, এবং যেহেতু আমিও তাই।
আসুন, আসন গ্রহণ করুন এখানে, আমারই পাশে।

(সোফার একপাশে সে
বসতে আহ্বান জানায়)

লুসিন্দো ॥ ধন্যবাদ, শ্রীমতী।

(পার্তিনিকে ফিসফিসিয়ে)

এবার যাওয়া যাক, এখনও সময় আছে,
সমস্ত সত্তা আমার ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে।

বিয়েত্রিসে ॥ আমি কি, আমি কি কোন অপ্রাসঙ্গিক
বক্তব্য রেখেছি ?

[লুসিন্দো কথা বলতে যায়, কিন্তু
পার্তিনি প্রসঙ্গ বদলায়]

পার্তিনি ॥ ওসব ছেড়ে কিছু ভালো কথা শোনাও এবার।
এসব কিছুই নয় বিয়েত্রিসে, সামান্য ব্যাপার,
সামান্য কিছু আলোচনা এর সঙ্গে।

লুসিন্দো ॥ (বিভ্রান্ত, অত্যন্ত নীরব গলায়)
হায় ভগবান, আপনি কি খেলা করছেন আমার সাথে !

পার্তিনি ॥ (উচ্চস্বরে)
এত গভীর ভাবে গ্রহণ করবেন না, ভীত হবেন না এতটুকু।
সুন্দরী বিশ্বাস রাখে আমার কথায়, তাই নয় ?
আর ইনি তো এখানেই থাকতে পারেন
তাই না বিয়েত্রিসে ? অন্ততঃ যতক্ষণ আমি না ফিরে আসি।
আর হ্যাঁ, একথাও মনে রাখবেন, আপনি বিদেশী,
পরিচিত নন, সুতরাং সাবধান, কোন মূর্খতা নয়।

বিয়েত্রিসে ॥ আমার অভ্যর্থনায় কি তখন এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছিল
যাতে আপনি মনে করতে পারেন, বিদেশী
হিসেবে আপনি যে-কোন মুহূর্তেই হতে পারেন বিপদের সম্মুখীন ?
আপনি পার্তিনির বন্ধু, আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিন,
অতিথির জন্য দরোজা সব সময় খোলা থাকে
এতো কর্তব্য আমার আশ্রয় দেওয়া সব্বাইকে।
আপনি প্রশংসা করবেন না, বলুন শুধু যেটুকু বলা দরকার।

লুসিন্দো ॥ হায় ঈশ্বর। আপনার আশ্চর্য দাক্ষিণ্য আমাকে মুগ্ধ করে !
আপনার বাচন ভঙ্গী যেন কোন দেবীর ভাষ্য।
মার্জনা করবেন, যদি ফেলে আসা আবেগ বন্য
আবারও বিদ্ধ করে মন, ভাসিয়ে নেয় তীব্র স্রোতে,
ওষ্ঠ দুটো যে কথাই বলতে চায় সে কথায় থাকে গভীর শাসন।

তথাপি দেখুন, আকাশ কি আশ্চর্য স্বচ্ছ ও মধুরিম,
মেঘের নীলাভ ছটা থেকে ছড়িয়ে পড়ে হাসির মতো
আমাদের ওপর, তার রঙ কি অদ্ভুত স্নিগ্ধ ও উচ্ছল,
এই যেন ছায়ায় মলিন, এই যেন ছটায় উজ্জ্বল,
সুরে-ছন্দে দীপ্ত, অথচ কেমন কোমল,
এক অপূর্ব ছবি, এক অপূর্ব আত্মা যেন।
আপনি একবার দেখুন, থাকুন নীরব, যদি অধর নির্বাক থাকে
তবুও যেন ফেনিল হৃদয় ছুঁয়ে যায় ঠোঁট
আর তখনই যেন ধৈর্য, নম্রতা নিমেষে উধাও।
আপনার ওষ্ঠ হৃদয়ের শব্দে স্পন্দিত হয়, প্রতিধ্বনি বাজে
ইয়োলিঅন বীণার সুরে, যেন তাকে
ঘিরে খেলা করে মত্ত জেফির।

বিয়েত্রিসে ॥ আমার অন্তরে তার কোন প্রমাণ পাই না,
যদিও আপনিই বিষকে দিলেন অমৃতের সন্ধান।

লুসিন্দো ॥ (আস্তে আস্তে পার্তিনিকে)
আপনি এক আশ্চর্য শঠ, উত্তম শঠও বটে।
এখন আমি করবো কি ? পালাবো ? যদি কিছু ঘটে !

পার্তিনি ॥ (উচ্চস্বরে) তার মনে শুধু এই আছে
এই মুহূর্তে যা প্রকাশ পেল আচম্বিতে,
সুন্দর কথার নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতা
শুধু আমার অনুপ্রবেশ তার বিঘ্ন ঘটায়।
কিন্তু কিছু মনে করবেন না, এটা বিয়েত্রিসেরই একান্ত বিশ্বাস
আপনার কথায় সে কিছু আনন্দ পেতে পারে
কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য, এবং আপনি তা নিশ্চয়ই করবেন
যে কোন জর্মনের মতোই, জর্মন রসিকতার মতোই
তা গ্রহণ করতে কিছু সময় লাগে। আপাততঃ আমি যাই।

লুসিন্দো ॥ (আস্তে) কিন্তু আপনি একটা শয়তান !

পার্তিনি ॥ (জোরে) ভাবুন একবার সহানুভূতির কথা
পেট থেকে বুকে শীঘ্রই উত্থিত হবে যা,
আমি ফিরব তাড়াতাড়িই আপনাকে নিয়ে যেতে

অথবা এমন সুন্দর জায়গায় না হয় গেলেনই থেকে।
(পাশে এসে, আস্তে)
আমাকে যেতেই হবে। নতুবা ওদিকে দেখা দিতে পারে
নতুন বিপর্যয়।
[পার্তিনি চলে গেলেন। লুসিন্দো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত]

বিয়েত্রিসে॥ আমি কি আবারও অনুরোধ জানাব আপনাকে
বসবার জন্যে ?

লুসিন্দো॥ নিশ্চয়ই বসব আমি, যদি আন্তরিক ইচ্ছে থাকে আপনার।
(বসে)

বিয়েত্রিসে॥ আমাদের বন্ধু পার্তিনিকে মাঝে মাঝেই এমন
আশ্চর্য খেয়ালী মনে হয়।

লুসিন্দো॥ হ্যাঁ, ভারী আশ্চর্য, অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার।
[কিছু নীরবতা]
মার্জনা করবেন, দেবী, আপনি কি তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদার
লোক বলে ভাবেন ?

বিয়েত্রিসে॥ তিনি এ বাড়ীর বহু পুরনো বন্ধু। আমার
সঙ্গে তাঁর সর্বদাই অত্যন্ত ভালো ব্যবহার।
তা সত্ত্বেও—আমি জানি না কেন তাঁকে এত
অসহ্য মনে হয় আমার। প্রায়ই তাঁর আচার হিংস্রের মতো।
মার্জনা করবেন, সে তো বন্ধু আপনার, তবুও
বলি, তার অন্তর থেকে সেই আহ্বান যেন উত্থিত হয়,
যা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।
কোন গুপ্ত অন্ধকারে যদিও তা প্রচণ্ড ঘূর্ণী, অথচ
দিনের আলোয় ভালোবাসার অপরূপ দৃষ্টি, ভীত,
অদ্ভুত রকমের ভীত তার প্রত্যুত্তরে, যা সে
উচ্চারণে আনে তার চেয়েও যেন নীচ, হৃদয় যা ভাবে
তার থেকেও সে ভয়ঙ্কর ! অবশ্য এ সবই আমার ধারণা,
সত্যি নাও হতে পারে, এ আমার সন্দেহ,
এবং সন্দেহ এক বিষাক্ত সরীসৃপ।

লুসিন্দো॥ সেই সন্দেহ আমাকে জ্ঞাত করায় আপনি কি দুঃখিত ?

বিয়েত্রিসে। যদি এমন হ'তো, এ শুধু আমাকেই ঘিরে—
নাঃ, কি বলছি আমি ; আপনি কি আমাকে
বিশ্বাস করেন ? এমন কোন ক্ষতি নেই যা জানি
সব যদি বলি আপনাকে আমি।
আমি যে কোন লোককেই তা বলতে পারতাম
যেহেতু সবাই যা জানে না, তা তো আমারও জানা নেই।

লুসিন্দো ॥ সব্বাইকে ! ভালোই বলেছেন ! সবাই-এর প্রতি এত দাক্ষিণ্য !

বিয়েত্রিসে ॥ কেন, আপনিও কি তার মধ্যে ন'ন ?

লুসিন্দো ॥ সুমধুর ঈশ্বরী আপনি।

বিয়েত্রিসে ॥ আপনি আমায় ভয় ধরালেন। এ কথার অর্থ কি ?
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এত ত্বড়িত গতি আপনার !

লুসিন্দো ॥ দ্রুত কাজ সারা উচিত। যেহেতু সময় ফুরিয়ে আসে।
দ্বিধা কেন ? মৃত্যু তো প্রতি মুহূর্তে।
আমি কি তাকে রুখতে পারি ? এ এক অলৌকিক ঘটনা,
এই যে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাত, অবিশ্বাস্য,
তবুও ঘটে, নিশ্চয়ই আমরা পরস্পরকে চিনতাম দীর্ঘদিন।
এ যেন এক অদ্ভুত সুমধুর সঙ্গীত, আমার হৃদয়ের কাছে
আমি কান পেতে শুনি, যেন তা জীবন খুঁজে পায়
এবং সেই দর্পণে, সেই তপ্ত অনুভবে
সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে আমাদের আত্মা এক হয়,
এক হয়ে যায়।

বিয়েত্রিসে ॥ আমি অস্বীকার করবো না যে আপনাকে আমি
বিদেশী বলেই ভেবেছি। এখনও আগন্তুক, অপরিচিত।
কিন্তু এখনও যখন তামসী হৃদয় পরস্পরকে
ভালো করে দেখতে দেয়নি, তখন আমাদেরই দেখতে হবে
জয় করতে হবে পরস্পরকে দূরবর্তী সম্মোহনী মন্ত্রে।
সতর্ক থাকতে হবে ভবিষ্যত সংঘটনায়
ঘন কালো মেঘ না যেন ঝলসায় কোন দুরন্ত বিদ্যুৎ।

লুসিন্দো ॥ দার্শনিক হৃদয় কি মনোরম সুন্দর। ঈশ্বর,
আমি তো কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারি না, আপনি দুর্বল

করে দিয়েছেন আমাকে। আমার মন ক্রমশঃ কঠিন হয়ে
উঠছে বলে মনে করবেন না যে আমি অশ্রদ্ধা করি আপনাকে।
হৃদয় আচ্ছন্ন আমার, স্নায়ুগুলো শিথিল,
প্রতিরোধে অক্ষম। আর কিছুকাল,
তারপরই আমি চলে যাব, চলে যাব বহুদূর,
আপনার কাছ থেকে। পৃথিবী তখন তলিয়ে যাক
তলিয়ে যাক অতলে, আমাকে ক্ষমা করুন, মার্জনা পাক
সেইসব মুহূর্তগুলো যারা আমাকে প্রেরণা দিয়েছিল
এই সম্মুখ তীব্রতায়।
বিয়েত্রিসে, আমি তোমাকে ভালোবাসি,
ঈশ্বরে শপথ করে আমি বলতে চাই,
বিয়েত্রিসে আর ভালোবাসা আমার কাছে শব্দ মাত্র একটাই,
বারবার ফিরে আসে আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে
এবং সেই চিন্তাতেই আমার সঙ্গে মৃত্যুর সাক্ষাত হবে।

বিয়েত্রিসে ॥ এতে কোন মঙ্গল হয় না। আমি অনুরোধ করি
একথা বো'ল না আর। যদিও তা হয় না তবুও বলি,
যদি আমার হৃদয়ই জয় করে থাকো তবে তো আর
শ্রদ্ধা করতে পারবে না। তখন তো তুমিই বলবে, হাজার
মেয়ের মতোই আমিও একজন, অতি সাধারণ।
আর এই চিন্তা এই ভাবনা তোমায় আচ্ছন্ন করবে যখন
তখনই তো সব ভালোবাসা, সমস্ত শ্রদ্ধার অবসান।
আসলে আমি তোমার এতটুকুও উপযুক্ত নই,
তার যত দোষ, তা আমি নিজেই নিতে চাই।

লুসিন্দো ॥ উর্বশী ভালোবাসা আমার, একবার শুধু আমার
কথাটা ভেবে দেখো,
যদি ঘনিষ্ঠ ভাবে একবার পড়ো আমার হৃদয়,
এখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনা, হায় ঈশ্বর,
তোমার আত্মধিক্কার কি নিখুঁত অভিনয় ভালোবাসার।
এসব কাজ ওই দোকানদারের, গড়িমসি মাপজোকে
যে মুনাফার অঙ্ক কষে।
ভালোবাসা সমস্ত পৃথিবীকে সংহত করে

তা ছাড়া অথবা তার বাইরে আর কিছুই নেই।
যারা নিজেদের জড়ায় ঘৃণ্য দ্বিধায়, তাদের জড়াতে দাও।
ভালোবাসা হলো জীবনের আগুন থেকে বিচ্ছুরিত আলো,
সেই আশ্চর্য যাদু যা আমাদের একটি বৃত্তে বেঁধে রাখে,
তার সৃষ্টিতে সেই একমাত্র পথ
যা শুধু ভালোবাসা দিয়ে গোণা যায়, কোন
অসহ্য অসতর্কতা নয়,
ভালোবাসা যেমন স্নেহের, তেমনই আশীর্বাদ।

বিয়েত্রিসে॥ আমি কি সংযমী হবো? লজ্জাবতী? না, আমি
দুরন্ত হতে চাই, যেমন আগুনের শিখা লেলিহান
হয়ে ওঠে। অথচ আমার বুক শংকায় ভারী
হয়ে আসে, যেমন ব্যথার সঙ্গে থাকে সুখ,
যেমন আমাদের এই মিলনে ষড়যন্ত্র কানাকানি করে
শয়তানের স্পর্দ্ধায়।

লুসিন্দো॥ এই সেই আগুন, যাকে তুমি জানোনি এর আগে কখনো,
এবং আমাদের ছেড়ে যাওয়া পুরনো জীবন যেন
তার শেষ কথা বলে যায়, তার সেই কথা আর
হয়ত নাও শোনা হতে পারে। কিন্তু তুমি বলো
বিয়েত্রিসে, কেমন করে তুমি হবে আমার!

বিয়েত্রিসে॥ আমার পিতার ইচ্ছে তাঁর নির্বাচিতের সঙ্গে
আমার বন্ধনের। কিন্তু আমি ঘৃণা করি তাকে,
যদি কোন মানুষকে ঘৃণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু তুমি
আমাকে নিশ্চয়ই আরও বুঝতে পারবে। কোথায় আছ এখন
তুমি, হৃদয়ের বন্ধু আমার?

লুসিন্দো॥ পার্তিনির বাড়িতে।

বিয়েত্রিসে॥ আমি একজনকে পাঠাচ্ছি তাহলে।
কিন্তু তোমার নাম? আমি জানি নিশ্চয়ই তার ছন্দ
নন্দিত করবে আকাশ।

লুসিন্দো॥ (গম্ভীর ভাবে) লুসিণ্ডো।

বিয়েত্রিসে॥ লুসিন্দো! কি অপূর্ব মিষ্টি নাম, অপূর্ব স্বর,
আমার হৃদয়ের রাজা, আমার পৃথিবী, আমার ঈশ্বর।

লুসিন্দো ॥ কিন্তু তুমি তো বিয়েত্রিসে, তার থেকে বেশি,
সব থেকে বেশি, যে কারণে বিয়েত্রিসে তুমি।
(লুসিন্দো বিয়েত্রিসেকে বুকে জড়িয়ে
ধরে। সহসা দরজা খুলে যায়।
প্রবেশ করে উইরিন।)

উইরিন ॥ কি অপূর্ব দৃশ্য! বিয়েত্রিসে, ঘৃণ্য সরীসৃপ,
সততার প্রতিমা, পাথরের মতো নিঃস্পন্দ!

লুসিন্দো ॥ এর মানে কি, কি চান আপনি?
এমন আদিম মানুষ ইতিপূর্বে দেখিনি।

উইরিন ॥ বুঝবেন, কি বলতে চাই আমি, সবই বুঝবেন।
আমরা দুজন কথা বলব, আপনি আর আমি, প্রতিদ্বন্দ্বী
দুই মানুষের ছদ্মবেশে থাকা ঔদ্ধত্যের প্রাণী,
কালি মুছে নেবার কাগজ যেন, যাতে মোছা হয়েছে
গোটা কলম, এমনই নায়ক আপনি যাকে শুধু
মিলনাত্মক নাটকেই মানায়।

লুসিন্দো ॥ কথার এমন ভাষা যা শুধু আদিম বর্বর মানুষেরাই ব্যবহার
করে। এমন আচরণে লজ্জা হওয়া উচিত আপনার।
ঠিক যেন অস্ত্রশস্ত্রের মতো বাজনা
শুধু যুদ্ধের ছবি আঁকতেই মানায়। হয়ত খুব দেরী না
করে তাই ঘটবে।

উইরিন ॥ শীগ্‌গীরই? তাহলে তো বিষয়টার তাই করতে হয়!
ঈশ্বর, আমার রক্ত এখন গভীর শীতলতায় প্রবাহিত,
বিয়েত্রিসে, আমি অবশ্যই একে করব নিষ্ক্রান্ত।

লুসিন্দো ॥ থামুন, বন্ধু থামুন, আমিও তা পারি।
(পার্তিনির প্রবেশ)

পার্তিনি ॥ একি গণ্ডগোল? তোমাদের কি ধারণা তোমরা
আছ এখন উন্মুক্ত রাস্তায়?
(উইরিনকে)
তুমিই বা চীৎকার করছ কেন? তোমার মুখ আমি
বন্ধ করে দেব।

[স্বগতঃ]

সময়মত এসে পড়েছি। আমার অর্থকে সে পারেনি
এখনও বুঝতে।

[সহসা বিয়েত্রিসে মূর্ছা যায়]

লুসিন্দো ॥ সাহায্য করুন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

[লুসিন্দো বিয়েত্রিসের ওপর ঝুঁকে পড়ে]

স্বর্গের অপ্সরী তুমি, কথা বলো, কথা বলো!

[সে চুম্বন করে]

তুমি কি উত্তাপ অনুভব করছ না?

তার চোখ খুলছে, সে নিচ্ছে নিঃশ্বাস!

বিয়েত্রিসে, তুমি কেন এমন হলে, কেন? বলো আমাকে!
তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও, কেমন করে দেখবো তবে?
(লুসিন্দো বিয়েত্রিসেকে ক্রমশ তুলে ধরে এবং বুকে জড়ায়।
উইরিন লুসিন্দোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু পার্তিনি
বাধা দেয়)

পার্তিনি ॥ এদিকে এসো বন্ধু, কানে কানে কিছু কথা বলি!

বিয়েত্রিসে ॥ (সংজ্ঞাহীন গলায়) লুসিন্দো ; লুসিন্দো আমার,
সব কিছু হারালাম, হারালাম তোমাকেই
একান্ত করে পাবার আগেই।

লুসিন্দো ॥ শান্ত হও, ঈশ্বরী, কিছুই হারাবার নেই
শীগ্‌গীরই আমি তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে চাই।

(সে তাঁকে সোফায় বসায়)

কিছুক্ষণ বো'স এখানে, বেশী সময় থাকা যাবে না
পবিত্র ভূমি কোন বিপদই আনতে পারে না।

উইরিন ॥ এদিকে আসুন, কিছু কথা আছে আমাদের।

পার্তিনি ॥ আমিও আসব।
দ্বন্দ্বে কারও সমর্থন নিশ্চয়ই অভিনব।

লুসিন্দো ॥ তুমি এখন ঘুমোও সুকন্যা, আনন্দে দীপ্ত হও।

বিয়েত্রিসে ॥ বিদায় প্রিয়তম।

লুসিন্দো ॥ বিদায় ঈশ্বরী।

বিয়েত্রিসে ॥ সুখের ভীতিতে হৃদয় আমার উজ্জ্বল।

[যবনিকা। প্রথম অংক শেষ]

উপন্যাস

স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স

কাব্যনাট্য 'অউলানেমের' মতো 'স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স' উপন্যাসটিও মার্ক্সের হাতে লেখা বই 'এ বুক অব ভার্স'-এ স্থান পায়। মার্ক্স এই বইটি পিতাকে উপহার দিয়ে তা মুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মার্ক্সের পিতা মার্ক্সকে এর উত্তরে একটি সুন্দর চিঠি দেন এবং তাতে একথাই বলেন যে একজন লেখকের সামাজিক দায়িত্ব প্রচুর এবং চিন্তা ও রচনাশৈলীতে তেমন এক যোগ্য জায়গায় পৌছলে তবেই বই ছাপাবার কথা ভাবা উচিত। মার্ক্সকে নিরুৎসাহিত করা এই চিঠির উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সম্ভবত এই চিঠির জন্যই মার্ক্স বই ছাপাবার ব্যাপারে আর উদ্যোগী হ'ন নি। ফলে হাতে লেখা 'এ বুক অব ভার্স'-এ উপন্যাসের যে-অংশগুলি মার্ক্স তুলে ধরেছিলেন তাই আজ অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে মাত্র। বাকিগুলির কোনো সন্ধান নেই। তবে উপন্যাসটি মার্ক্স যে সম্পূর্ণ করেছিলেন তা উপন্যাসটি পড়লেই বোঝা যায়। প্রথম প্রকাশিত হয় জর্মনে ১৯২৯ সালে, ইংরেজীতে

প্রথম খণ্ড

দশম অধ্যায়

তাহলে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, যে প্রতিজ্ঞা আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে করেছি, উপরোক্ত পঁচিশজন কথকের সমষ্টি মূলতঃ আমাদের প্রিয় লর্ডের নিজস্ব সম্পত্তি।

আশ্চর্যের কথা, তাদের কোন প্রভু নেই! উন্নত এবং অদ্ভুত চিন্তাধারা, কোন বিষণ্ন শক্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে না, তথাপি সেই গর্বিত শক্তি সুউচ্চ মেঘের সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে ভেসে যায়, সবাইকে আলিঙ্গন করে, এমন কি সেই পঁচিশজন কথককেও; তার ডানা দিয়ে, দিন থেকে রাত্তির, সূর্য থেকে নক্ষত্রালোক পর্যন্ত, সুউচ্চ-শিখর পর্বত ও সীমাহীন মরুভূমি থেকে, শব্দের সুষমায় যা ঐকতান সৃষ্টি করে এবং জলপ্রপাতের মতই ভয়ঙ্কর, এ যেন সেই ছবি যেখানে কোন মৃত্যুশীল হাত কখনই গিয়ে পৌঁছয় না, এমন কি সেই পঁচিশজন গল্পকথকও, এবং—কিন্তু আমি তো আর বলতে পারি না, আমার অংর উত্তাল হয়ে ওঠে. আমি গভীরভাবে ভাবি সকলের কথা, আমার নিজের কথা এবং অবশ্যই সেই পঁচিশজন গল্পকথকের, এই তিনটি শব্দের মধ্যে কোনও রহস্যের অবস্থান, তাদের অবস্থানবিন্দু নিঃসীমে, তাদের শব্দ এক মধুর সঙ্গীত, তারা পুনরুচ্চারণ করে সেই শেষ বিচার এবং সরকারী রাজস্বের কথা, যেন—তার নাম গ্রেথে, রান্নার কাজ করে সে, যাকে স্করপিয়্যান বিচলিত করে তুলেছিল তাঁর বন্ধু ফেলিক্সের কথা বলে, তাকে সম্মোহিত করেছিল তার জাদুময় সুরধ্বনির স্পর্শে, তার যৌবন দৃপ্ত আবেগ দিয়ে তাকে করেছিল আবিষ্ট, তার হৃদয়ের কাছে নিয়ে এনেছিল তাকে, তার ভেতরে রচনা করেছিল একটি ছোট্ট পরীর মাধুর্য!

অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পরীরা দাড়ির পোষাক পড়ে থাকে, যেমন ম্যাগডালেনে গ্রেথে, অবশ্যই অনুতপ্ত ম্যাগডালেনে নয়, মঞ্চ থেকে নেমে এলেন ঈর্ষান্বিত যোদ্ধার মত তাঁর নিজেরই সম্মানে দাড়ি-গোঁফ নিয়ে, নরম পেলব গাল সুন্দরভাবে আবরিত করে রেখেছেন, চিবুক যেন নিঃশব্দ একাকী সমুদ্রে উত্থিত কোন শৈলশিখর—বহুদূর থেকে লোকটি যেন ধরে আছে, চ্যাপটা কর্মঠ এক বিশাল মুখ থেকে যেন আচম্বিতে নির্গত, উদ্গত, নিজস্ব মহত্ত্বের অধিকারে যেন স্বতস্ফূর্ততায় এবং গর্বে অলঙ্কৃত, বাতাসকে দুহাতে সরিয়ে যেন ঈশ্বরের বেদীকে ছুঁতে চায়, কর্তৃত্ব চাপাতে চায় সমস্ত মানুষের ওপর।

আজগুবি এবং উদ্ভট কল্পনার দেবী, মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখেন এক শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌন্দর্যের এবং ক্রমশঃ সেই বিশাল এবং ব্যাপক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যান ; যখন ঘুম ভাঙে, তাকিয়ে দেখেন, এ সেই গ্রেথে, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, দারুণ ভয়ের স্বপ্ন, যেন সে ছিল ব্যাবিলনের এক প্রখ্যাত বেশ্যা, সেণ্ট জনের বাণী এবং ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং সুন্দর খাঁজকাটা চামড়ার ওপর যে তৈরী করেছে এক চমৎকার ফসল কেটে নেওয়া মাঠ, যাতে সেই রমণীর সৌন্দর্য কোন অপরাধের জন্ম দিতে না পারে এবং যাতে সেই রমণীর যৌবন প্রতিরক্ষিত হয়, যেমন গোলাপের চারদিকে ঘিরে থাকে কাঁটা, যাতে সমস্ত পৃথিবী—

দ্বাদশ অধ্যায়

"একটি ঘোড়া ! একটি ঘোড়া ! একটি ঘোড়ার জন্য আমার এই রাজত্ব !" বলেছিল তৃতীয় রিচার্ড।

"একজন স্বামী, একজন স্বামী, একজন স্বামীর জন্য আমি", গ্রেথে বলে ওঠে।

ষোড়শ অধ্যায়

"সৃষ্টির শুরুতে ছিল শব্দ, শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, এবং শব্দই ছিল ভগবান। এবং শব্দ ছিল মাংসের, আমাদের মধ্যে রেখেছিল দ্বন্দ্ব, এবং আমরা তার গরিমাকে তুলে ধরেছিলাম।"

অর্থহীন, অজ্ঞান অথচ সুন্দর চিন্তা। তথাপি এই সব ধারণাই গ্রেথেকে এইরকম একটি চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল যে পৃথিবীর অধিষ্ঠান উরুর মধ্যে, যেমন শেক্সপীঅরে থারসাইট বিশ্বাস করে অ্যাজাক্স তাঁর সমস্ত রসবোধ সঞ্চিত করে রেখেছেন তাঁর পেটে আর সমস্ত বুদ্ধি তাঁর মাথায়, এবং শেষ পর্যন্ত এটাও বুঝতে পেরেছে যে অ্যাজাক্স নয়, গ্রেথে —এবং তারপর বুঝল শব্দ কেমন করে মাংস দিয়ে তৈরী হয়েছে, উরুর মধ্যে সেই রমণী তার প্রতীকি প্রকাশ লক্ষ্য করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—তাদের মুছে ফেলতে।

উনবিংশ অধ্যায়

কিন্তু সেই রমণীর আছে দুটি নীল চোখ। এবং নীল চোখ হলো একটি সাধারণ দর্শনস্থল, যেমন—

তাদের প্রকাশ ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা মূর্খতা। অজ্ঞানতার ছাপ লেগে আছে, সে অজ্ঞানতা তার নিজের জন্যই দুঃখিত বা লজ্জিত, একটা জলীয় অজ্ঞানতা যেন, যা আগুনের নিকটতম উপস্থিতিতে উবে গিয়ে ধূসর বাষ্প হয়ে যায়, এবং এই চোখ দুটির পেছনে আর কোন কিছুই নেই, তাদের আত্মা একটি নীল রঙের থলি যেন। কিন্তু বাদামী চোখের বেলায়—সেখানে আদর্শের স্পর্শ আছে, এবং অনন্ত, অসীম রাত্রির পৃথিবীকে নিদ্রিত রাখে যেন তাদের গভীরে, ভেতর থেকে আত্মা যেন বিদ্যুতের মতো চমকায়, এবং তাদের শব্দ যেন মিগননের সঙ্গীত, অনেক দূরে যেন এক উজ্জ্বল কোমলভূমি যেখানে বাস করেন এক ধনী ভগবান, যিনি তার নিজস্ব গভীরতায় নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং যিনি তার নিজস্ব অস্তিত্বে বিশ্বজনীনতা খুঁজে পান, নিঃসারিত করেন অনন্তকে এবং ধারণ করেন অনন্তকে। আমরা যেন একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছি, আমরা বুকে জড়িয়ে ধরেছি সুরসমৃদ্ধ, দৃপ্ত, হৃদয়বান অস্তিত্বকে এবং চোখ থেকে টেনে নেব আত্মা, এবং তাদের ভেতর থেকে রচনা করব সঙ্গীত।

সেই ব্যাপক প্রাণময় পৃথিবীকে আমরা ভালোবাসি যা আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, আমরা দেখি পেছনের অনেক উজ্জ্বল চিন্তা, আমাদের অনুভবে আসে অনেক ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর দুর্যোগ, এবং আমাদের সামনে অদ্ভুত উজ্জ্বল মূর্তিরা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে, ভেসে আসে কাছে, এবং অনুগ্রহণের পর লাবণ্যের মতো বিনম্র লজ্জায় বিদায় নেয়।

একবিংশ অধ্যায়

ভাবাতাত্ত্বিক চিন্তা

ফেলিক্স অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে তাঁর বন্ধুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল। তাঁর এই আবেগময়তার কথা সে ভাবতেই পারেনি। এবং সেইমুহূর্তে সে তাঁর নিজস্ব ভাব নিয়েই অভিভূত ছিল, যার প্রতি আমরা এখন চূড়ান্ত তলব জারী করছি এই মহৎ কাজের ধারকটিকে উপস্থিত করার জন্য, কারণ সেটিই আমাদের মূল কাহিনী।

সুতরাং মের্টেনও খুব গভীরভাবে নিজের কথা ভাবল, ফেলিক্স ভাবল এই ভাবনাখানা তারই জন্যে ঘটেছে, তারই ঐতিহাসিক হাতের মাধ্যমে।

মের্টেন নামের সঙ্গে মনে পড়ে চার্লস মার্টেল-এর কথা। ফেলিক্স নিজে অবশ্যই বিশ্বাস করত এক প্রচণ্ড আঘাতের কথা, ধাক্কাখানা এমনই জোরালো ছিল।

সে তার চোখ দুটো খুলল, তার পায়ের পাতার ওপর প্রসারিত করল, তার অন্যায়ের কথা ভাবল একবার, আর ভাবল 'শেষ বিচারের' কথা।

কিন্তু আমি বৈদ্যুতিক বিষয়টির ওপর ধ্যান করা শুরু করলাম, তার নিকেলের ওপর, জ্যামিতিক বান্ধবীর কাছে লেখা ফ্রাঙ্কলিনের চিঠিগুলোর ওপর, এবং মের্টেন সম্পর্কে, কেননা এই নামের পেছনে কি রহস্য আছে তা জানার এক অদম্য কৌতুহল আমাকে পেয়ে বসেছিল।

কোন সন্দেহই নেই যে, লোকটি মার্টেল-এর সরাসরি বংশধর : এই খবর আমি পেয়েছিলাম গীর্জার যে লোকটি কবর খোঁড়ে তার কাছ থেকে, যদিও এই সময়ে কোনও সংবদ্ধতা ছিল না।

'ল' পরিবর্তিত হয়েছে 'ন'তে। এবং ইতিহাসের সঙ্গে যারাই একটু পরিচিত তারাই জানেন, মার্টেল একজন ইংরেজ এবং ইংরিজীর 'আ' জর্মনে 'এহ্' উচ্চারিত হয় এবং তারপর ওটা 'এ' হয়ে মের্টেন-এ পরিণত হতে বেশী সময় লাগে না। অথবা মের্টেন-শব্দটি মার্টেলেরই আরেকটি প্রতিশব্দ হতে পারে।

পুরনো আমলের জর্মন নামগুলোতে তাদের অবস্থা-ব্যবস্থার কথাও প্রকাশ পেত। যেমন ক্রুগ দ্য নাইট, রাউপাখ্ দ্য হোফ্রাটি, হেগেলি দ্য ড্যফ´, এইসব। এথেকে এটাও ধারণা করা যেতে পারে যে মের্টেন একজন ধনী সম্ভ্রান্ত লোক, যদিও ব্যবসার দিক থেকে সে একজন দর্জি এবং এই কাহিনীতে যে স্করপিয়্যানের জনক হিসেবে পরিচিত।

এ থেকে আর একটি তত্বে উপনীত হওয়া যেতে পারে : আংশিকভাবে সে একজন দর্জি, এবং আংশিকভাবে, যেহেতু তাঁর সন্তানের নাম স্করপিয়্যান, সেহেতু মার্স বা মঙ্গলের বংশধর হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। মার্স, মানে যুদ্ধের দেবতা, জেনেটিভে মার্টিস, গ্রীকে মার্টিন, অতঃপর মের্টিন, এবং সবশেষে মের্টেন। আর একদিকে দেখতে গেলে যুদ্ধের দেবতার কাজও হলো ওই দর্জির মতো, শুধু কেটে যায়, হাত কাটে, পা কাটে, পৃথিবীর সমস্ত সুখশান্তিকে কেটে টুকরো করে।

উপরন্তু স্করপিয়্যান, একটি অত্যন্ত বিষাক্ত জীব, মুহূর্তের মধ্যে খুন করতে পারে, যার কামড় সাংঘাতিক, চোখে যার হত্যার আলো ঝিলিক দেয়, যুদ্ধের একটি সুন্দর রূপক, যার স্থিরদৃষ্টি প্রাণঘাতী, যার সামান্য আবেশ আক্রান্তকে বিবময় করে তোলে, ভেতরে ভেতরে ঘটায় রক্তক্ষরণ, অতীতকে বিস্মৃত করে।

যাই হোক, মের্টেন কিন্তু এতটুকুও পৌত্তলিক ইহুদি নয়, বরং মনে মনে সে খ্রীষ্টান, এমনকি এই সম্ভাব্যতাই প্রবল হয় যে সে সেণ্ট মার্টিনের বংশধর। ইংরিজী বানানের স্বরবর্ণের একটু এদিক-ওদিক করে আমরা পাচ্ছি মির্টান। সাধারণ মানুষ

ই-এর জায়গায় অনেক সময় 'এ' উচ্চারণ করে, যেমন 'গিব মের'-এর বদলে 'গিব মির'। আর ইংরিজীতে যেকথা আগেই বলেছি, 'আ' অনেক সময়েই উচ্চারিত হয় 'এহ্', সময়ের প্রবাহে যা ক্রমেই 'এ'-তে চলে আসে, বিশেষ করে সংস্কৃতির প্রভাবে এবং তার ফলে মের্টেন নামটা দাঁড়িয়ে যায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই এবং তার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় একজন খ্রীষ্টান দর্জি।

যদিও এইরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌছুবার যুক্তি প্রচুর, ফলে সম্ভাবনাও যথেষ্ট, তাহলেও আর একটা প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ না করে পারছি না যার ফলে সেণ্ট মার্টিনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। সেণ্ট মার্টিন, তাঁকে পেট্রন সেণ্ট বলা ভালো। কারণ আমরা যতদুর জানি তিনি কখনই বিবাহ করেন নি এবং সেই কারণে তার কোন পুরুষ বংশধর থাকা সম্ভব নয়।

এই সন্দেহটা পুনঃপ্রযোজ্য হতে পারে পরবর্তী ঘটনায়। ভিকার অব ওয়েকফিল্ডের মতো মের্টেন পরিবারের সকলেরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ করে ফেলার একটা অভ্যেস ছিল, ফলে প্রত্যেক বংশই নিজেদের মির্থেন (হলুদ) মালায় গ্রথিত হয়ে অলঙ্কৃত করত নিজেদের—এবং সম্ভবতঃ এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা—যদি না কেউ আবার এর মধ্যে এসে যাদু ঘটায়—মের্টেন-এর জন্মের এবং এই কাহিনীতে স্করপিয়্যানের জনক হিসেবে আবির্ভাবের।

মির্থেন-এর থ-এর মধ্যে (ট+হ) হ'-টা প্রায় উঠেই যায়, যেহেতু শেষ দিকে 'এহ্'[১] উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত এবং তার ফলে মির্থেন-এর (ট+হ+এ) 'হএ' বাদ পড়ল এবং মির্থেন এল মির্টেন-এ।

মির্টেন-এর মি-তে যে ওয়াই আছে তা গ্রীক ভি বা আদতে জর্মন অক্ষরই নয়। আমরা আগেই প্রমাণ করেছি, মের্টেন পরিবার পুরোপুরি জর্মন। এবং একই সঙ্গে খৃষ্টান দর্জি পরিবার। বিদেশী এবং পৌত্তলিক 'ওয়াই' অক্ষরটি জর্মন 'আই (উচ্চারণ ই)-তে রূপান্তরিত হয়েছে ; এবং একই পরিবারে যেহেতু বিবাহ একটা প্রধান ধারা, এবং যেখানে 'ই' উচ্চারণ মের্টেন-বিবাহের কোমলতার পাশাপাশি অত্যন্ত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ উচ্চারণ রাখে তাই তা বদলে 'এহ্' হয়ে যায় এবং তারপরে বলার সময়ে যখন এই জোরটা থাকে না তখন সাধারণ 'এ' যার মধ্যে বিবাহ (জর্মনে এহে) কথাটির একটা সুপ্ত আস্বাদ থেকে যায় ; জর্মন মের্টেনে যেমন একাধিক অর্থ লুকিয়ে আছে, মির্থেনে কিন্তু সেদিক থেকে একটি মাত্র সংবদ্ধ অর্থই আছে।

এই সমস্ত বাদ দিয়েও আমাদের যা দরকার তা হলো সেণ্ট মার্টিনের খ্রীষ্টান দর্জি মার্টেল-এর প্রশংসনীয় উত্তম। যুদ্ধের দেবতা মার্সের ঝটিতি সিদ্ধান্ত বিবাহ সম্ভাবনার

১. জর্মনে এহে (উচ্চারণে এহ হয়ে যায়) মানে বিবাহ।

সঙ্গে যুক্ত হয়ে মের্টেন-এর মধ্যে দুটো 'এ' এনেছে, এবং বস্তুতঃ পক্ষে এই তত্ত্ব পূর্বের সমস্ত তত্ত্বকে এর মধ্যে যেমন একত্রিত করেছে তেমনি সবকটিকেই আবার বাতিল করে দিয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যিনি অত্যন্ত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন সেই ভাষ্যকার একটি স্বতন্ত্র মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তার কাছ থেকেই আমাদের এই কাহিনীর প্রাপ্তি।

যদিও এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না, তাঁর মন্তব্যে অবশ্য একটা সমালোচনা-মূলক মূল্যায়ন আছে, কেননা বস্তুতপক্ষে এই ভাবনাটা এমন একজন মানুষের মন থেকে বেরিয়ে এসেছে যিনি ধূমপান সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে এক ব্যাপক জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছেন। যেন তাঁর পার্চমেণ্ট কাগজগুলো পবিত্র তামাককে জড়িয়ে রাখে এবং তারফলে এক পিথিয়ান উল্লাসের ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে দৈববাণীর মত তিনি প্রত্যাদেশ দান করে থাকেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, মের্টেন কথাটি অবশ্যই জর্মন মেহ্‌রেন থেকে এসেছে (মানে গুণ করা), যা মূলত এসেছে ম মেত্র্যর (মানে সমুদ্র) কথাটি থেকে, যেহেতু সমুদ্রের বালির মতনই মের্টেনের বিবাহের সংখ্যা গুণ করা যেতে পারে এবং যেহেতু একজন দর্জির ধারণায় মেহ্‌রের (যে গুণ করে) অর্থ রীতিমত আবদ্ধ, কেননা বানর থেকে মানুষ সেই সৃষ্টি করেছে। তার উপপাদ্য প্রতিষ্ঠা করার মতই এটা দীর্ঘ অনুসন্ধানের পথে।

যেহেতু আমি তা পড়ছি, পড়তে গিয়ে বিস্ময় আমাকে হতবুদ্ধি করে, তামাকের প্রত্যাদেশ আমাকে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু তার পরেই ঠাণ্ডা, হতাশা সঞ্চারিত হয় এবং নিম্নলিখিত পাল্টা-যুক্তি দেখা দেয়!

আমি পূর্বোক্ত ভাষ্যকারের কথা মেনে নিচ্ছি যে কোন দর্জির ধারণার মধ্যে গুণকের অর্থ যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু কোনও গুণকের (যিনি গুণ করেন) মধ্যে কোন বিয়োগকের চরিত্র থাকবে একথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায়না কারণ এটা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার, কনট্রাডিক্টো ইন টারমিনিস, যাকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করে মহিলাদের কাছে বলতে পারি, ঈশ্বরই হলেন শয়তান, শয়তানই ঈশ্বর, চায়ের টেবিলে যেন কিছু রসিকতা অথবা বলতে পারি মহিলারাই হলেন আসল দার্শনিক। কিন্তু 'মের্টেন' কথাটি যদি 'মেহ্‌রেন' কথাটি থেকেই আসে, তবে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে একটা শব্দ হারিয়েছে এবং তা আর ফিরে পাওয়া যায়নি, একটা 'হ', যা তার পরিচিত চরিত্রের বিষয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং 'মেহ্‌রেন থেকে 'মের্টেন' কথাটি সম্ভবতঃ আসেনি। এবং মেত্র্যর

থেকে তার যে উৎপত্তি হয়নি সেকথা প্রমাণিত হতে পারে এইভাবে যে, মের্টেন পরিবার কখনই বা কোনদিনই জলে পড়েনি অথবা আকাশে ওড়েনি, কিন্তু তাঁরা ধর্মপ্রাণ একটি দর্জি পরিবার, যা বন্যা এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, যে-কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত গ্রন্থকার, তাঁর অকাট্যতার পরিবর্তে একটি বড়ো ধরনের ভুলই করেছেন এবং আমাদের সিদ্ধান্তই সঠিক।

এইরকম একটা বিজয়ের পর আমি স্বভাবতঃই অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আরও এগিয়ে যাবার পক্ষে কিছুটা অবসন্ন এবং আত্মসুখে কিছুটা মগ্ন, যার একটা মুহূর্ত, ভিঙ্কেলমান যেকথা বলেছেন, উত্তরসূরীদের হাজার প্রশস্তির চেয়েও আনন্দদায়ক, যদিও এব্যাপারে তরুণ প্লিনির মতো আমিও সেই বিশ্বাসে মগ্ন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

"Quocumque adspicias, nihil est nisi pontus et aer,
    Fluctibus hic tumidis, nubibus ille minax,
Inter utrumque fremunt immani turbine venti :
    Nescit, cui domino pareat, unda maris,
Rector in incerto est : nec quid fugiatve petatve
    Invenit : ambiguis ars stupet ipsa malis."[১]

"যেখানে খুশী তাকাও তুমি, সর্বত্রই, অন্য কিছু নয়, স্করপিয়্যান ও মের্টেন,
    একজন ভাসমান অবিরাম অশ্রুধারায় অন্যজনে আবিষ্ট মেঘগম্ভীর ক্রোধ।
শব্দেরা শুধু বন্য ঝড়ের মতো করে মাতামাতি, প্রান্তে থাকে দুজন,
    আন্দোলিত সমুদ্রও জানে না, কার প্রতি জানাবে মান্যবোধ।
আমি কর্ণধার, পারি না নিতে কোন সিদ্ধান্ত এই লেখনীতে, শুধু নির্বিকার,
    উত্তেজনায় থরোথরো, আবেগ শুধু এপার ওপার।"

সুতরাং ওভিদ তাঁর ত্রিস্তিয়াতে সেই বিষণ্ণ কাহিনী শুনিয়েছেন, যা কালের ছায়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার পরে এসেছে। কাজটা সম্পূর্ণভাবেই তার ক্ষমতার বাইরে ছিল, কিন্তু গল্পটাকে আমি এগিয়ে নিতে চাই এইভাবে—

১. ওভিদের ত্রিস্তিয়া থেকে

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ওভিদ তোমিতে বসেছিলেন, যেখানে দেবতা অগাস্তুস সক্রোধে তাঁকে নিক্ষেপ করেছেন, কেননা জ্ঞানের থেকেও অতিরিক্ত প্রতিভা তাঁর ছিল। সেখানে বন্য বর্বরদের মধ্যে ছিল নম্র ভালোবাসার কবি, যাদের বদ্ধ প্রেমই তাকে এনেছে। চিন্তায় বিভোর, ডানহাতের ওপর ভর দিয়ে থাকে মাথা, আর তাঁর দীর্ঘায়িত চোখ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে অতিদূর সৌরসীমানায়। গায়কের মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল, তবুও সে তার আশাকে কোনরকমেই বিসর্জন দিতে পারেনি, স্তব্ধ রাখতে পারেনি সুরের মূর্ছনা। বরং সেই দীর্ঘায়িত মিষ্টি ছন্দের তরঙ্গে কেঁপে উঠেছে তাঁর সমস্ত বেদনা ও যন্ত্রণার আকাশ।

বৃদ্ধ লোকটির শীর্ণ এবং দুর্বল প্রত্যয়কে ঘিরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে উত্তুরে বাতাস, যেন সে নিদারুণ এক ভয়ে জর্জর, কম্পমান, যেন দক্ষিণের উষ্ণ প্রদেশে সে কতই না সুখে ছিল, কতই না মধুর ছিল তার জীবন, এবং সেখানেই তাঁর সমস্ত কল্পনা হৈ-চৈয়ের উত্তপ্ত উল্লাসে ফেটে পড়ত আশ্চর্য স্বতস্ফূর্ততায় এবং যখনই প্রতিভার এই শিশুরা অতিরিক্ত দৃঢ় এবং ঋজু হয়ে উঠত, তখনই তাদের কাঁধ বেয়ে নামত লাবণ্যের অপরূপ পবিত্রতা, আবরিত করে, মালায় যেন তা হালকা তালে ক্রমেই ছড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, এবং উষ্ণ শিশির বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে টুপটাপ।

'খুব শীগ্‌গীরই মিশে যাবে মৃত্তিকায়, হতভাগ্য কবি!' এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ লোকটির গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা, যখন—স্করপিয়্যানের বিরুদ্ধে উচ্চারিত মের্টেনের তীব্র এবং তীক্ষ্ণ নিম্নস্বর শোনা গেল—

সপ্তবিংশ অধ্যায়

'অজ্ঞানতা, অসীম অনন্ত অজ্ঞানতা।'

'কারণ (পূর্ববর্তী একটি অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কোন একটি দিকে তাঁর হাঁটু বড়ো বেশী ঝুঁকে পড়েছিল।' কিন্তু : সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সংজ্ঞা, এবং কে সংজ্ঞা নির্বাচন করবে, কে বিচার করবে কোনটা ডানদিক বা কোনটা বাঁদিক?

তাহলে তুমিই আমাকে বলো, হে মরণ আমার, বাতাস কখন প্রবাহিত হয় অথবা ঈশ্বরের মুখমণ্ডলে নাক আছে কি-না। এবং তখনই আমি তোমাকে জানাতে পারি বাঁ দিক অথবা ডান দিকের ঠিকানা।

সবই আপেক্ষিক ধারণা, জ্ঞানসুধা পান করা মানে শুধু মূর্খতা আর সাময়িক উন্মত্ততাকে লাভ করা।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডানদিক এবং বাঁদিক সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না

পারছি ততক্ষণ শিরায় শিরায় চাঞ্চল্য, সমস্ত ভাবনাই মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা। ছাগলগুলোকে বাঁ হাতে এবং ভেড়াগুলোকে ডান হাতে তাকে রাখতে হবে।

যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়, যদি সে মুখ রাখে অন্য নির্দেশে, যেহেতু রাত্রিতে তাঁর জন্য একটি স্বপ্ন ছিল, তবে আমাদের মজার ধারণায় ছাগলগুলো আসবে ডানহাতে এবং সেইসব ধর্মভীরু বাঁহাতে।

সুতরাং আমাকে বলে দাও কোনটা ডানদিক কোনটা বাঁদিক, তাহলেই সৃষ্টির সমস্ত ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে, অ্যাকেরোণ্টা মোভেবো, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে ঠিক কোন দিকে তোমার আত্মা এসে দাঁড়াবে, এবং তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তও নিতে পারব বর্তমানে তুমি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো ; প্রভুর সংজ্ঞা অনুযায়ী সেই প্রাথমিক সম্পর্কের সূত্রে তুমি কতদূরে দাঁড়িয়ে আছো তাও পরিমাপ করা সম্ভব হবে, কিন্তু তোমার বর্তমান পরিস্থিতি বা উপস্থিতি জানা যেতে পারে তোমার মাথার খুলি কতটা পুরু হয়েছে তা দিয়ে। আমি একেবারেই হতবুদ্ধি—যদি কোন মেফিস্টোফিলিস আবির্ভূত হয় তবে আমি ফাউস্ট, যেহেতু আমরা জানি না কোনটা ডানদিক আর কোনটা বাঁদিক, আমাদের জীবন সেক্ষেত্রে এক সার্কাস, আমরা বৃত্তাকারে দৌড়চ্ছি, পাশ বা ধার খোঁজার চেষ্টা করছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত বালির ওপর পড়ে যাচ্ছি, আর সেই মত্তদানব জীবন, সেই মুহূর্তে আমাদের হত্যা করছে। যেহেতু তুমি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছ, তুমি চিন্তাকে করেছ চুরমার, স্বাস্থ্যকে করেছ দুর্বল, যেহেতু তুমি আমাকে হত্যা করেছ, সেহেতু আমাদের একজন নতুন পরিত্রাতা চাই—আমরা ডান দিক বাঁদিক ঠিক করতে পারি না, আমরা জানি না কোন দিকে ডান দিক আর কোন দিকে বাঁদিক—কোনদিক, কোনদিকে…

অষ্টবিংশ অধ্যায়

"চাঁদের মধ্যে, খুবই পরিষ্কারভাবে চাঁদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রশিলা, রমণীর বুকে মিথ্যার বীজ, সমুদ্রে রয়েছে বালি এবং পৃথিবীতে রয়েছে পর্বত।" আমার দরজায় যে কড়া নাড়ছিল, এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়েছিল, সেই লোকটির উত্তর।

আমি খুব তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলো একধারে সরিয়ে নিলাম, বললাম আগে তার সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত, এবং সেটা এখন হওয়াতে বেশ ভালই লাগছে আর কি এবং তার শিক্ষার মধ্যে প্রভূত জ্ঞানের চিহ্ন রয়েছে, আর বললাম, তার প্রতিটি কথাতে আমার গভীর সন্দেহ সঞ্জাত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে

একটা কথা হলো আমি যদি দ্রুত কথা বলি সে বলে দ্রুততর। তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ বেড়িয়ে আসছে, এবং সম্পূর্ণ মানুষটা, আমি যে ভাবে কাছে থেকে ভালো করে দেখেছি, ঠিক যেন লুকিয়ে যাওয়া টিকটিকি, যেন গাঁথনি তোলার মতো ধীরে ধীরে একটু একটু করে বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে যায়।

তার গঠনটা খুবই গাট্টাগোট্টা। আর কাঠামোর সঙ্গে আমার স্টোভটার কিছু মিল আছে। তা চোখ দুটোকে সবুজই বলতে হবে, লাল নিশ্চয়ই নয়, আলোর চমকানির বদলে সেখানে তীক্ষ্ণ এক ঔজ্জ্বল্য, আর সে নিজে মানুষের থেকেও যেন বেশি, একটা আস্ত ভূত।

প্রতিভাধর! আমি বিনা বিলম্বে তা স্বীকার করি, এবং অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গেই, তার মাথার খুলি থেকে উত্থিত হয়েছে তার নাক, পিতা জিউসের মস্তক থেকে যেমন উৎসারিত হয়েছে পাল্লাস অ্যাথেনা, যে ঘটনার সঙ্গে আমিও এর উজ্জ্বল লাল বর্ণকে বায়ু-তারঙ্গিক উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করেছি, যেখানে মাথাকেই বিবৃত করা যায় চুলহীন হিসেবে, যদি না মাথার এই আবরণকে কেউ কেশবিন্যাসের জন্য সুগন্ধি পদার্থের একটি হিসেবে মনে করেন, যা বায়ু এবং পদার্থটির দ্বিবিধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আদিম পর্বতকে কঠিন ভাবে আবৃত করে।

তার মধ্যে সবকিছুই প্রকাশিত হয় আশ্চর্য উচ্চতা এবং সুনীল গভীরতায়, কিন্তু তার মুখের গঠনে একটি কাগুজে মানুষের ব্যাপ্ত বিশ্বাসঘাতকতা, তার গাল দুটো এমনই তোবড়ানো যেন ঝকঝকে বেসিন, উঁচু উঁচু হাড় দিয়ে বৃষ্টির বিরুদ্ধে এমনই সুরক্ষিত যে যে-কোন সরকারী নথিপত্র অথবা ডিক্রিপত্র রাখার নিরাপদ সিন্দুক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অর্থাৎ স্পষ্ট ভাবে অল্প কথায় বলা যায় তার সব কিছুর মধ্যে এমন একটা ছবিই প্রকাশিত যেন সে নিজেই ভালোবাসার দেবতা, যেন সে তা নয়, অথচ সেটাই সে বোঝাতে চায়। এবং তার নামেও যেন একটা মাধুর্য আছে, একটা মিষ্টি আবেশের বৃত্ত আছে, যেন এক লহমায় বুনো ঝোপের কথা মনে করিয়ে দেয় না।

আমি তার কাছে নিজেকে শান্ত রাখার আবেদন জানিয়েছিলাম, যেহেতু সে নিজেকে নায়ক হিসেবে দাবী করে। তাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে নায়কেরা সাধারণতঃ হয় অন্য ধাতুর, একটু অগোছালো কিন্তু অনেক বেশি মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর, এবং নায়ক, সবশেষে বলা যায় সৌন্দর্যেরই আরেক রূপ, একটি সত্যিকারের সুন্দর চরিত্র যার মধ্যে আঙ্গিক এবং আত্মা পরস্পর মিলেমিশে একাকার, এবং উভয়েরই দাবি সেই রমণীর সমস্ত সঠিক স্বকীয়তার জন্য কৃতিত্ব তাদেরই এবং সেই কারণে সেই রমণী তার ভালোবাসার যোগ্য ছিল না।

কিন্তু সে একথা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার একটি অত্যন্ত শ—শ—শক্তিশালী হাড়—কাঠা-ঠা—মো আছে এবং তার ছা—ছা—ছায়া যে কোন ব্যক্তির মতনই ভালো, এমনকি বেশি ভালো, যেহেতু সে তার নিজের সম্পর্কে আলোর থেকে ছায়াপাতই করে বেশী, তার ফলে তার স্ত্রী ও নিজেকে শীতল করতে পারে তার ছায়ায়, প্রসারিত করতে পারে, এবং অবশেষে নিজেও একটি ছা—ছা—ছায়ায় পরিণত হতে পারে, এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি হলাম অত্যন্ত অসভ্য এবং নিকটস্থগুণসম্পন্ন একটি মানুষ, এবং একটি পঙ্কিল-প্রতিভা, তর্কাতর্কির ব্যাপারে মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীব, এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাকে এঙ্গেলবের্ট নামে ডাকা হয়েছিল যা স্ক—স্ক—স্করপিয়্যান নামের চেয়ে অনেক ভা—ভা—ভালো শুনতে এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে ঊনবিংশ অ—অ—অধ্যায়ে আমি একটা ভুল করেছি কারণ বাদামী চোখের তুলনায় নীল চোখ অনেক বেশি সুন্দর, এবং ঘুঘু পাখীর চোখ সব থেকে বেশি আধ্যাত্মিক এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে যদিও সে নিজে ঘুঘু পাখী নয় কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে একেবারেই বধির,[১] এবং তারই পাশাপাশি সে অগ্রজত্বের অধিকার লাভ করেছে এবং দখল করেছে একটি পরিষ্কার ও কাচাকাচি করবার নিজস্ব দপ্তরখানা।

"স্—স্—সে আমার ডানহাতখানা তাব হাতের মধ্যে তুলে নেবে, এবং এখন আর আপনার ডানদিক বাঁদিক খুঁজে দেখবার কোন কারণ নেই, কারণ সে ঠিক বিপরীত দিকে বাস করে, ডান দিকেও নয়, বাঁদিকেও নয়!"

দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, আমার আত্মার ভেতর থেকে উত্থিত হলো এক অপচ্ছায়া, সুমিষ্ট স্বর গেল বন্ধ হয়ে, শুধু দরজার চাবির ফুটো দিয়ে ভেসে এলো এক ভৌতিক ফিসফিসানি : ক্লিংহোলৎজ! ক্লিংহোলৎজ!

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। পাশে বসে লক, ফিখ্‌টে এবং কাণ্ট! গভীরভাবে ভেবে শুধু আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলাম, অগ্রজত্বের অধিকারের সঙ্গে নিজস্ব এবং আলাদা ধোবিঘরের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!

এবং সহসা আমার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। চিন্তায় একটা সুরেলা তরঙ্গে আমার চোখের সামনে যেন একটার পর একটা ছবি ফুটে উঠল এবং তারপর একটি উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ চিত্রের দেখা পেলাম।

১. Es ist nicht taube. Sondern tauber, জর্মন ভাষায় taube মানে ঘুঘু পাখী, tauber মানে বধির। উচ্চারণের সম-ধ্বনি লক্ষণীয়।

অগ্রজত্বের অধিকার হচ্ছে মূলতঃ অভিজাততন্ত্রেরই ধোবিঘর। যেহেতু ধোবিঘর স্থাপনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিষ্কার বা কাচাকাচির কাজ করা। কিন্তু কোন কিছু ধোয়া জিনিসটাকে সাদা করে, অর্থাৎ একটা মলিন উজ্জ্বলতা এনে দেয়। ঠিক তেমনি অগ্রজত্বের অধিকারও বাড়িব বড়ো ছেলেকে রূপোব মত চকচকে করে, আবার রূপোর মতোই এক বিবর্ণ উজ্জ্বলতা এনে দেয়, অন্যদিকে বাড়ির আব সবাইয়ের ওপর এনে দেয় দারিদ্র্যের এক রোমান্টিক নিষ্প্রভতা।

নদীতে চান করে যে লোকটি সে ফুলে ওঠা ঢেউয়েব বিরুদ্ধে ফুলে উঠে, জলোচ্ছ্বাসেব বিরুদ্ধে লড়াই করে, শক্ত বাহুতে মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যে এই ধোবিঘরে বসে থাকে চাব দেয়ালকে নিয়ে এক ব্যাপ্ত নির্জনতায় সে ডুবে যেতে চায়।

আব সাধাবণ মবণশীল যারা অর্থাৎ যাদের এই অগ্রজত্বের অধিকার নেই জীবনের ঝড়েব সঙ্গে তাবা লড়াই করে, সমুদ্রেব অতলে নিক্ষেপ করে নিজেদের, সেই গভীর থেকে তুলে নিয়ে আসে প্রমিথিউসীয় অধিকারেব মতো মণিমুক্তো, আর তার চোখেব সামনে 'ধাবণা'র আভ্যন্তরীণ আঙ্গিক ঝলসে ওঠে আগুনের মতো, আবও আরও গভীর সৃষ্টিব মধ্যে সে মগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যাব কাঁধে থাকে অগ্রজত্বের বোঝা, পাছে কোন অঙ্গ বিকল হয়ে পড়ে এই ভয়ে শুধু অশ্রুপাত কবে, ধোবিঘরে বসে থাকে চুপচাপ।

পাওয়া গেছে, দার্শনিকের পাথরখানা পাওয়া গেছে এতক্ষণে!

ত্রিংশ অধ্যায়

পাশাপাশি রাখা ছুটি ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আজকের দিনে কোন মহাকাব্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ, ডান দিক বাঁ দিকের ব্যাপারটায় ভালোভাবে বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে আমরা তাদের কাব্যিক ভাবনার প্রকাশেব ছোঁয়া পেয়ে থাকি যেমন মারসিয়াসের ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিল অ্যাপোলো এবং তাদেরকে একটা সন্দেহের গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল, ঠিক বিকৃত আকারের বেবুনের মতো। যার সুস্থ চোখ আছে কিন্তু তা দেখার জন্য নয়। যেন গ্রীক পুরাণের সেই শতচোখ বিশিষ্ট দস্যু আর্গুসের বিপরীত একটি ছায়া; আর্গুসের শত চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হারানো জিনিসের সন্ধানে, আর সে, স্বর্গের হতভাগ্য ঝড়স্রষ্টা, সন্দেহ এবং দ্বিধাতেই যে ভরপুর, শত চোখ নিয়ে বসে আছে যা দেখা যায় তাকে দেখতে না পাবার জন্যে।

কিন্তু এই বিষয়, এই পরিবেশ হলো মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান, এবং যখন খুব শীগ্‌গীর আর কোন বিষয় থাকবে না, আমাদের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় হিসেবে যা ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে, যখন দামামার প্রচণ্ড শব্দ জেরিকোকে জাগিয়ে দেবে, মহাকাব্য তখনই মৃত্যুর মতো গহীন নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠতে পারে।

উপরন্তু, আমরা দার্শনিকদের সেই পাথরখানা আবিষ্কার করেছি, প্রত্যেকেই পাথরটির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, অঙ্গুলিনির্দেশ করে এবং তাঁরা—

একত্রিংশ অধ্যায়

স্করপিয়্যান এবং মের্টেন নীচে মাটিতে বসে ছিল। একটি অতিপ্রাকৃতিক ভীতি তাদের স্নায়ুকে এত বেশি দুর্বল করে ফেলেছিল যে সম্প্রসারণের হৈ-হল্লায়, ঠিক গর্ভস্থ সন্তানের মতো জাগতিক সমস্ত সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোন পৃথক এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মিলিত শক্তি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন এবং শিথিল হয়ে পড়ছিল। এবং এমনই অবস্থা যে তাদের নাক নেমে আসছিল নাভির নীচে। মাথা ঝুলে লুটোচ্ছিল ধূলোয়।

মের্টেনের গা থেকে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছিল—বেশ ঘন রক্ত, লৌহ আকরিকে পরিপূর্ণ। লৌহের পরিমাণ কতটা সেটা অবশ্য আমি বলতে পারব না। কারণ রসায়ন শাস্ত্রের সাধারণ স্তর খুব সন্তোষজনক নয়।

বিশেষ করে জৈব রসায়ন প্রতিদিনই সরলীকরণের মাধ্যমে অধিকতর জটিল হয়ে পড়ছে। যতই প্রতিদিন নতুন নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে বিশপদের একটা সামঞ্জস্য আছে। তাঁরা এমন কিছু দেশের নাম উচ্চারণ করে থাকেন যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এক অবিশ্বাস্য পৃথিবীতে অবস্থিত! উপরন্তু নামগুলো এমনই দীর্ঘকায় যা কোন বহুবিধ শিক্ষিত কোন সমাজের কোন সদস্যের এবং জর্মন সম্রাটের যুবরাজের পদবীর সমান। এমন নাম যা অনেক নামের মধ্যে মুক্ত-চিন্তাবিদ। কারণ তারা নিজেদের কোন ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ করে না, কোন ভাষার কাছেই বাঁধা নয়।

সাধারণভাবে কোন অপ্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জৈব রসায়ন রীতিমতো বিরুদ্ধবাদী। জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ করে থাকে, যেমন, যদি আমি বীজগণিত থেকে ভালোবাসা আদায় করতে চাই।

এর সম্পূর্ণটাই পরিষ্কারভাবে পদ্ধতির তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে আছে, যা এখন

পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়নি,' হয়ত কখনই করা যাবে না। কারণ এটা তাসের খেলার ওপর নির্ভর করে আছে, যে খেলাটা সম্পূর্ণই সুযোগের খেলা, টেক্কা যেখানে মাথার ওপর বসে আছে।

এই টেক্কাই, যেভাবেই হোক, সমস্ত আইন-বিজ্ঞানের ভিত। ধরা যাক কোন এক সন্ধ্যেয় ইরনেরিউস সমস্ত তাস হারিয়ে সোজা একটি মহিলা পার্টি থেকে ফিরে এলো! একটা নীল চমৎকার টেইল-কোর্ট পরে সুন্দর সেজে, লম্বা বক্‌লস্ লাগানো নতুন জুতো পরে। আর একটা ক্রিমসন সিল্কের ওয়েস্টকোট পরা অবস্থায় এসে বসলো, এবং বসে 'যেমন' কথাটা নিয়ে একটা প্রবন্ধ রচনা শুরু করলো, এবং সেখান থেকে সে রোমান আইন শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ হলো।

এখন রোমান আইন সব কিছুকেই দখল করেছে। তার মধ্যে পদ্ধতির তত্ত্ব আছে আবার রসায়নও আছে—যেন এটা একটা ক্ষুদ্রজগৎ, ক্ষুদ্রপৃথিবী যা ক্ষুদ্রপৃথিবী থেকে ভেঙেই হয়েছে, যে কথা পাসিউস বলেছেন।

বিধির চারটি অধ্যায় হলো চারটি উপাদান, পানডেক্টের সাতটি অধ্যায় হলো সাতটি নক্ষত্র এবং আইন-সংহিতার বারোটি অধ্যায় হলো রাশিচক্রের বারোটি চিহ্ন।

অর্থাৎ কোন আত্মাই এই সমগ্র বিষয়টিকে গ্রথিত করতে পারনি, যে পেরেছে সে হলো গ্রেথে, আমাদের রাঁধুনি, যে শুধু বলে যায়, খাবার তৈরী।

তীব্র হিংসাত্মক প্রতিবাদে স্করপিয়্যান এবং মের্টেন তাদের চোখ বন্ধ করে ছিল। যে কারণে গ্রেথেকে তারা পরী অথবা জাদুকরী হিসেবে ভুল করেছে। শেষ পরাজয় থেকে ডন কার্লোসের বিজয় পর্যন্ত সময়কালের স্পেনীয় ভীতি থেকে যখন তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল তখন মের্টেন নিজে স্করপিয়্যানকে তিরস্কার করেছিল, ওক গাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমালোচনায়, যেন আহা, মোজেজ বলবেন, মানুষকে নক্ষত্রদের সম্পর্কে ভাবতে দাও, নীচে মাটির দিকে তাকাতে দিও না; ইতিমধ্যে স্করপিয়্যান তার পিতার হাত দখল করে নিয়েছে এবং তার দেহকে এক বিপজ্জনক স্থানে স্থাপন করেছে তার নিজের দুপায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

"হায় ঈশ্বর! মের্টেন কাজে-কর্মে সহযোগিতার দিক থেকে মন্দ নয়, কিন্তু সে দরও যে হাঁকায় খুব চড়া!"

"Vere! beatus Martinus bonus est in auxilio, sed carus in negotio!"—পইতিয়েরসের যুদ্ধের পর ক্লভিস চীৎকার করে উঠেছিলেন যখন তুর্সের

ধর্মযাজকরা তাকে বলেছিল যে যে-বর্ম পরে ঘোড়ায় চেপে তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন সেই চামড়ার বর্ম তৈরী করেছিল মেটেন, এবং এরজন্য সে দু'শ স্বর্ণমুদ্রা চায়।

কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার পেছনে মূল সত্য হলো এই—

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়

তারা সবাই টেবিলে বসে ছিল। সবার ওপরে মেটের্ন। স্করপিয়্যান তার ডানদিকে, অপেক্ষাকৃত প্রবীন শিক্ষানবীশ ফেলিক্স বাঁ-দিকে, আর টেবিলের নীচের অংশে উত্তম এবং অধম ব্যক্তিদের মধ্যবর্তী শ্রেণীর মেটের্ন রাজনৈতিক সংস্থার অধস্তন কর্মচারীরা, একটু একটু ফাঁক ফাঁক করে, যাদের আমরা সাধারণ শিক্ষানবীশ বলতে পারি।

এই মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলি কোন মানবিক প্রাণীর দ্বারা দখলীকৃত হওয়া সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কোর ভূতও তা অধিকার করেনি, সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে মেটের্নের কুকুর, প্রতিদিনই সে টেবিলের শোভা এইভাবেই বর্ধন করে থাকে। মেটের্ন, যিনি মানবিক বোধ মানবিক প্রীতি ইত্যাদির উৎপাদন বন্দোবস্ত করে থাকেন, এই ধারণা পোষণ করেন যে তাঁর বোনিফাসে, কুকুরটিকে তিনি ওই নামেই ডাকেন, জর্মনীর অন্যতম ধর্মসংস্কারক নেতা সেণ্ট বোনিফাসের মতই একক এবং সম-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং এব্যাপারে তিনি একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে থাকেন প্রায়শই যেখানে সেণ্ট বোনিফাসে নিজেকে বলেছেন তিনি একটি চীৎকৃত কুকুর (এপিস্ট ১০৫, পৃঃ ১৪৫, সেরারিয়া সম্পাদিত দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এই কুকুরটির জন্য তিনি কুসংস্কার-জনিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি মনে মনে পোষণ করেন এবং সেই কারণে টেবিলের ওপর কুকুরটির জন্য একটু সুরুচিসম্পন্ন আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বোনিফাসে বসে একটা চমৎকার নরম তুলোর ক্রিমসন কম্বলের ওপর, তার চারদিকে রেশমের পার দেওয়া ঝালর, যেন দেখাচ্ছে এক বহুমূল্য কৌচ। নীচে তার পরপর স্প্রীং লাগানো যাতে ঝাঁকুনি না লাগে, সভা শেষ হলেই আসনটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একেবারে আলাদা করে খিলান-বারান্দার শেষ কোণায়, ছবিটা দাঁড়ায় ঠিক সেই নগরীর শান্তিরক্ষকের বিশ্রাম গ্রহণের মন্দিরের মতো, যে উপমাটি বইলেআউ তার পাট্রিয়ে-তে উল্লেখ করেছিলেন।

বোনিফাসে তখন তার জায়গায় ছিল না, ফাঁকটুকু তখনও পূর্ণ হয়নি, মেটের্নের-চিবুক বেয়ে রং ঝরে পড়ছিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তিনি হাঁক দিলেন : বোনিফাসে

কোথায়? সমস্ত টেবিলটা থরথর শব্দে কেঁপে উঠল। বোনিফাসে কোথায়? মেটে´ন আবার চীৎকার করে উঠলেন এবং যখন শুনলেন বোনিফাসে সেখানে নেই তাঁর সারা দেহ জুড়ে ভয়ের ছায়া নেমে এলো, প্রত্যেকটি অঙ্গ কাঁপতে লাগলো, চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো টানটান হয়ে।

প্রত্যেকেই উঠে পড়ল বোনিফাসেকে খুঁজতে। মেটে´নের সাধারণ প্রশান্তি এখন এক ধূসর মরুভূমির রূপ নিয়েছে। মেটে´ন ঘণ্টি বাজালেন। গ্রেথে প্রবেশ করল, তার হৃৎপিণ্ড ধুকুপুক করছিল অজানা আশংকায়, সে ভাবছিল—

'হে-ই, গ্রেথে, বোনিফাসে কোথায়?' এবং গ্রেথে যেন দৃশ্যত রেহাই পেল। এবং ক্ষিপ্ত থাবায় মেটে´ন নিভিয়ে দিলেন আলো, অন্ধকার ঢেকে ফেলল সব কিছু, যেন গভীর রাত্রি নেমে এলো প্রচণ্ড ঝড় এবং দুর্ঘটনা নিয়ে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ডেভিড হিউমের ধারণা ছিল এই অধ্যায়টি হলো মূল কাহিনীর প্রস্তাবনা বা ভূমিকা এবং তিনি লেখার কাজ শেষ করার আগে পর্যন্ত এই ধারণাই মনের মধ্যে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষের প্রমাণাদি হলো; যতক্ষণ এই অধ্যায়ের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ পূর্ববর্তী কোন অধ্যায়ের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এই অধ্যায়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়টিকে নির্মূল করে দিয়েছে যা থেকেই এই বর্তমানটির উদ্ভব, যদিও কারণ এবং ফলাফল সংক্রান্ত কার্যধারার মধ্যে দিয়ে নয়। এবং সেই কারণেই তিনি প্রশ্ন রাখেন। তথাপি প্রতিটি দানবকেই এবং সেই সূত্রে বিশ লাইনের প্রতিটি অধ্যায়কেই মনে হয় এক একটি বামন, প্রতিটি প্রতিভাবানই এক একটি রাখা-ঢাকা ফিলিষ্টাইন, এবং সমুদ্রের প্রতিটি ঝড়ই—কাদা, এবং যে মুহূর্তে প্রথমটির কাজ শেষ ঠিক সেই মুহূর্তে পরেরটির কাজ শুরু, ঠিক যেন টেবিলে বসে আস্তে আস্তে গোঁয়ারের মতো ছড়িয়ে দেয় ঠ্যাং।

এই পৃথিবীর পক্ষে প্রথম দুটি খুবই বড় এবং সেই কারণেই এগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরের ধাক্কাটার উৎস এখানেই, এখানেই সেটা রয়ে গেছে, যাতে যে কেউ ঘটনার মধ্যে থেকে তা দেখতে পারে, বুঝতে পারে, যেমন নাকি একবার শ্যাম্পেনের স্বাদ গ্রহণ করবার পরও দীর্ঘক্ষণ তার রেশ থেকে যায়, নায়ক সীজার যেমন তাঁর পেছনে রেখে যান অভিনেতা অক্টাভিয়াসকে, সম্রাট নাপোলিঁয় যেমন রেখে গেছেন বুর্জোয়া রাজা লুই ফিলিপকে, দার্শনিক কান্ট রেখে গেছেন কার্পেট নাইট ক্রুগকে, কবি শিলার রেখে গেছেন হোফ্রাট রাউপাখকে, লাইবনিৎজের

স্বর্গ রেখে গেছে নেকড়ের শিক্ষালয়, তেমনি কুকুর বোনিফাসে রেখে গেছে এই অধ্যায়।

অর্থাৎ ভিত বা খাঁচাটা শুধু রয়ে গেল, ভেতরের আত্মা বা শক্তি শূন্যে উধাও।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ভিত বা খাঁচা সম্পর্কে শেষ কথাটি একটি বিমূর্ত ধারণা, এবং সেই কারনেই তা কোন মহিলা নয় যেমন অ্যাডেলুং সোল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলেন, একটি বিমূর্ত ধারণা এবং একটি রমণী, কি অদ্ভুত পার্থক্যময়! সে যাই হোক, আমি ঠিক এর বিপরীত ধারণা পোষণ করি, এবং সময়মত তা প্রমাণ করব, শুধুমাত্র এই অধ্যায়েই নয়, এমন একটা বইয়েও আমি এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রমাণ করব যেখানে কোন অধ্যায়ই থাকবে না, এবং হোলি ট্রিনিটি গ্রহণ করবার অব্যবহিত পরেই আমি সেই বই লেখায় মনোনিবেশ করব।

উনচল্লিশতম অধ্যায়

কেউ যদি এই একই বিষয় সম্পর্কে বিমূর্ত হয়, কোন ঋজু এবং পরিচ্ছন্ন ধারণা গ্রহণ করতে চায়—আমি গ্রীক হেলেন বা রোমান লুক্রেশিয়ার কথা বলছি না বরং হোলি ট্রিনিটির কথা—তাহলে আমি তাকে কিছু না-র স্বপ্ন ছাড়া আর কোন ভালো উপদেশই দিতে পারি না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ে, বিকল্পে বলতে পারি প্রভুর প্রতি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি রাখতে এবং এই কথাটিকে পরীক্ষা করতে, কেননা এর মধ্যেই আসল ধারণা সমাহিত। আমরা যদি সেই ধারণায় চলি, আমাদের বর্তমান অবস্থানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং মেঘের মতো এর ওপর ভেসে, আমরা সেই দানবীয় না-এর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হব; আমরা যদি ঠিক এর মাঝামাঝি থাকতে চাই তবে আমাদের জড়িয়ে থাকবে সেই কিছু না-র ভয়; আর আমরা যদি এর গভীরে নিমজ্জিত হই তখন উভয়ই আবার সংযুক্তভাবে প্রকাশিত হয় না-তে, যার উত্থানের ফলে উজ্জ্বল শিখার মতো দৃপ্ত চরিত্র সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে মিলনের জন্য।

'না'—'কিছুই না'—'না'

এই হলো ট্রিনিটির আসল এবং ঋজু ধারণা। কিন্তু বিমূর্তের জন্য—কে তা মেপে দেখবে, যেমন:

কে স্বর্গে গেছে অথবা নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে? কে তার বজ্রমুষ্টিতে ধরে রাখতে পেরেছে বাতাস? কে ধরে রাখতে পেরেছে পোষাকের মধ্যে জল অথবা শেষ দেখেছে পৃথিবীর? কি নাম তার, আর তার ছেলের নামটাই বা কি, তুমি যদি বলতে না পারো?—বলল ধার্মিক সলোমন।

চল্লিশতম অধ্যায়

"আমি জানি না সে কোথায়, কিন্তু এই অতিরিক্তটুকুও সঠিক, একটা মাথার খুলি বস্তুত একটি মাথার খুলিই!"—চীৎকার করে উঠল মেটে'ন। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সে আবিষ্কার করতে উদ্যত হয়েছিল তার হাত অন্ধকারের মধ্যে কার মাথা স্পর্শ করেছিল, এবং তারপরই সে ক্রমশঃ পেছনে হঠতে থাকে কোন এক মরণশীল ভয় এবং আতঙ্কে, যেন চোখদুটি—

একচল্লিশতম অধ্যায়

হ্যাঁ, অবশ্যই। সেই চোখ দুটি।

ও দুটো যেন চুম্বক, লোহাকে আকর্ষণ করে, ঠিক যে কারণে আমরা রমণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি, অথচ স্বর্গের প্রতি নয়, যেহেতু রমণীরা দুচোখ দিয়ে আমাদের দেখে, কিন্তু স্বর্গ আমাদের দেখে এক চোখ দিয়ে।

বেয়াল্লিশতম অধ্যায়

'আমি তাকে এর বিপরীত প্রমাণ করে দেবো।' একটা অদৃশ্য স্বর যেন আমার কানে কানে বলে গেল, আর যেই আমি চারিদিকে তাকালাম কে বলে গেল তা দেখতে, আমি দেখলাম—তুমি হয়ত বিশ্বাসই করবে না, কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, আমি শপথ করে বলতে পারি যে, একথা সত্যি—আমি দেখলাম—অবশ্যই তুমি রাগ করো না, ভীতও হয়ো না, যেহেতু এব্যাপারে তোমার স্ত্রী বা তোমার হজমী শক্তির কোনও রকম কিছু করবার উপায় নেই—আমি নিজেকে দেখলাম, যেন আমি নিজেই নিজেকে উপস্থিত করেছি প্রতিবাদ-প্রমাণ হিসেবে।

এই চিন্তা—"হায়রে, আমি কি হতভাগ্য"—আমার মধ্যে যেন বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে গেল, এবং হফমানের শয়তানের সেই আত্মপ্রকাশীরূপ—

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

আমার টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটি ভাবনা। ঠিক এই মুহূর্তে আমি যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম, ঘুরে বেড়ানো যাযাবর ইহুদিরা কেন বের্লিনের প্রতিবেশী হলো, কেন তারা স্প্যানিয়ার্ড নয়, কিন্তু এটা মিলে যাচ্ছে, আমার মতে, আমি অবশ্যই এর পাল্টা প্রমাণ দেখাব, আমাদের যে-জিনিসটা করতে হবে, অন্ততঃ স্পষ্টতার খাতিরে, অন্য কিছুই নয়, একটা ধারণায় স্থির থাকতে হবে। ধারণাটা হলো এই, রমণীর চোখ স্বর্গে থাকে না, স্বর্গ থাকে রমণীর চোখে। এ থেকে এমন একটা মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে যে, চোখ আমাদের আকর্ষণ করে না। বরং আকর্ষণ করে সেই চোখের ভেতরের স্বর্গ। এ থেকে এই প্রতিপাদ্যে পৌঁছনো যায় যে স্বর্গের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই, রমণীর প্রতি হই না, যেহেতু উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী স্বর্গের একটাই মাত্র চোখ নেই না, কোন চোখই নেই, একটাও চোখ নেই। তথাপি স্বর্গ ঈশ্বরের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত অসীম ভালোবাসার দৃষ্টিপথ ছাড়া আর কিছুই নয়, অবশ্যই শান্ত এবং বিনম্র, আলোক-আত্মার সুরধ্বনিময় নয়ন, এবং একটি চোখের কখনই একটি চোখ থাকতে পারে না।

অর্থাৎ আমাদের তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল তাহলে দাঁড়াল এই ; আমরা কেন রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হই বা কেন স্বর্গের প্রতি আকৃষ্ট হই না এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, স্বর্গে আমরা রমণীদের চোখ দেখতে পাই না, অথচ রমণীর চোখে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। এবং আমরা সেই চোখের প্রতি নিজেদের আকর্ষণ অনুভব করি, সত্যি কথা বলতে, কারণ তারা চোখই নয়। এবং যেহেতু যাযাবর আহাসুয়েরুস বের্লিনের একজন প্রতিবেশী, যেহেতু সে বৃদ্ধ এবং অসুস্থ এবং বহু দেশ ও বহু চোখ দেখেছেন, তথাপি তিনি স্বর্গের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ অনুভব করেন না, কিন্তু রমণীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রচণ্ড এবং পৃথিবীতে দুটি মাত্র চুম্বক আছে, চোখ ছাড়া একটি স্বর্গ এবং স্বর্গহীন একটি চোখ।

একটির অবস্থিতি আমাদের ওপরে। যা আমাদের উত্থিত করে। অন্যটি আমাদের নীচে, আমাদের ক্রমেই নীচে নিয়ে যায়। এবং আহাসুয়েরুস ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে, তা নাহলে সে পৃথিবীর সমস্ত ভূমি পায়ে পায়ে পার হয়ে সারাজীবন শুধুই ঘুরে বেড়াবে কেন ? এবং চিরদিন কি সে ঘুরে বেড়াত এইভাবে যদি না সে হতো বের্লিনের প্রতিবেশী আর ব্যবহার করত বালি ?

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

হালটোর চিঠিপত্র বিষয়ের দ্বিতীয় কাহিনী

আমরা একটা গ্রামের বাড়ীতে এলাম। চমৎকার দিন সেটা, কালচে নীল

রাত্রি। তোমার হাত দুটো ছিল আমার মধ্যে। তুমি মুক্ত হয়ে ভাঙতে চাইছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছিলাম না। আমার হাত দুটো তোমাকে বন্দী করে রেখেছিল যেমন তুমি বন্দী করে রেখেছিলে আমার হৃদয়। এবং তুমিও তাই চাইছিলে।

আমি দীর্ঘ কথামালায় হালকাভাবে গুনগুন করছিলাম, আমার বেয়াদপি ছিল খুবই অন্তস্রোতা, মরণশীল মানুষ যা সব থেকে সুন্দর বলতে পারে আমি হয়ত তাই বলছিলাম, আমি হয়ত কিছুই বলছিলাম না, আমি নিজেরই মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম যেন, আমি যেন এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ দেখতে পেলাম যেখানে বাতাস যেমন অনেক বেশি আলোকিত উজ্জ্বল, তেমনি ভারী, এবং সেই ইথারে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি পবিত্র নারী মূর্তি, অদ্ভুত সৌন্দর্যমণ্ডিত, যেন এক গভীর অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকে দেখেছি কিন্তু পরিচয় হয়নি, এক আধ্যাত্মিক আগুনের প্রভা যেন তার সর্বাঙ্গ মেখে রয়েছে, সে হাসছে হাল্কাভাবে মিটিমিটি আর, আর তুমি, তুমিই তার প্রতিচ্ছবি।

আমি নিজেকে দেখেই অবাক হয়ে গেছি, আমার ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আমি মহত্ব অর্জন করেছি, এক অসাধারণ মহত্ব। যেন আমি ধরে রেখেছি এক বিরাট অসীম অনন্ত সমুদ্র, কোন বন্ধনই যেন তাকে বেঁধে রাখতে পারছে না, শাশ্বত এবং গভীরতাকে তা ছুঁতে পেরেছে ঃ এই সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ যেন স্ফটিক আর তার গভীর কালো জলরাশিতে যেন ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার সোনালী নক্ষত্র, তারা ভালোবাসার গান করে, প্রেমসঙ্গীত, তারা ছুঁড়ে দেয় অগ্নিকণা আর তাতে সমুদ্র হয়ে ওঠে রক্তবর্ণ।

জীবনটা যদি শুধু এইরকমই হতো ?

আমি তোমার মিষ্টি নরম হাতখানাতে চুম্বন এঁকে দিলাম, আমি ভালোবাসার কথা বললাম, বললাম তোমার কথা। আমাদের মাথার ওপর ভাসছে চমৎকার কুয়াশা। ওর হৃদয়টা ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে ফোঁটা ফোঁটা কান্না হয়ে ঝরছে আমাদের মধ্যে, আমরা সেই কান্না অনুভব করতে পারছি, তাই চুপচাপ, মৌন এবং নিঃশব্দ—

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

"এটা হয় বোনিফাসে নয়ত এক জোড়া ট্রাউজার!" চিৎকার করে উঠল মের্টেন। 'আলো, আমি বলছি, আলো!' এবং সেখানটা আলোকিত হয়ে গেল। 'হায় ঈশ্বর, এ তো ট্রাউজার নয়, এ যে বোনিফাসে, এই ঘুটঘুটে অন্ধকার কোনায় পড়ে

আছে, তার চোখে জ্বলছে ধারালো আগুন। কিন্তু এ আমি কি দেখছি। ওর চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে!'—আর একটি কথা না বলেই সে নীচে চলে গেল। শিক্ষানবীশরা প্রথমে কুকুরটিকে দেখল, তারপর দেখল তার প্রভুকে। কিছুটা দূরে সে সশব্দে লাফিয়ে পড়ল। 'এই গাধারা কি জন্য এরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে! তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা পবিত্র বোনিফাসে আহত? আমি এ ব্যাপারে কঠোর তদন্ত করব এবং অপরাধীদের শাস্তি দেব। কিন্তু আপাতত তাকে শীগ্‌গির চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসাও, ডাক্তারকে ডাকো, ভিনিগার আর কেঁচোর জল নিয়ে এসো, আর স্কুলশিক্ষক ভিটুসকে ডাকতে ভুলো না যেন। বোনিফাসের ওপর তার কথার প্রভাব সাংঘাতিক!' হুকুম সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো। তারা দরজা দিয়ে বেরিয়েই সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মের্টেন খুব কাছে এসে বোনিফাসেকে দেখল। যার চোখে তখন এতটুকু ঔজ্জ্বল্যের ছায়াও নেই, তারপর মাথা নাড়াল অজস্রবার।

'হতভাগ্যকে আমি ভয় করি, প্রচণ্ডরকমের, হতভাগ্যজনক ঘটনা! একজন যাজককে ডাকো!'

আটচল্লিশতম অধ্যায়

যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তত একজন সাহায্যকারীও ফিরে এলো, মের্টেন শুধু পায়চারী করে বেরালো ততক্ষণ।

'হায়রে দুর্ভাগা বোনিফাসে! দাঁড়াও একটু! এর মধ্যে যদি আমি আমার চিকিৎসা না করতাম তবে কি হতো? তোমার জ্বর হয়েছিল, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসছিল, তুমি খাবার খাচ্ছিলে না, আমি দেখলাম তোমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা; আমি বুঝলাম বোনিফাসে, আমি তোমাকে বুঝতে পারলাম!'— আর ঠিক সেই সময়ে গ্রেথে এসে ঢুকল ভিনিগার আর কেঁচোর জল নিয়ে।

"গ্রেথে! বোনিফাসে সুস্থভাবে শেষ হাঁটাচলা করছিল কদিন হলো? আমি কি তোমাকে বলিনি ওকে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ভালো করে চান করাবে? আমি দেখছি এবার থেকে এইসব ভারী ভারী কাজ আমাকেই করতে হবে। যাও, তেল, লবণ, মধু, তুঁষ নিয়ে এসো!"

'হায়রে দুর্ভাগা বোনিফাসে! তোমার সমস্ত উজ্জ্বল চিন্তাধারাই আবদ্ধ হয়ে রইল, অপ্রকাশিত রয়ে গেল, কারণ তুমি আর কোনদিনই তা বলতে অথবা লিখতে পারবে না।

হে গভীরতার আশ্রয়স্থল! হে ধর্মীয় আবদ্ধতা'!

কবিতাগুচ্ছ

মার্ক্স তাঁর কবিতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রথিত করেছিলেন। য়েনীকে নিবেদিত কবিতাগুলিকে তিনি ভাগ করেন বুক অব লভ, প্রথম খণ্ড এবং বুক অব লভ দ্বিতীয় খণ্ডে। এছাড়াও য়েনীকে দেন বুক অব সংস। আর পিতাকে দেন এ বুক অব ভার্স। এ বুক অব ভার্সে বুক অব সংস বা অন্যান্য খণ্ডের কিছু কবিতাও সংকলিত হয়। ফলে সামগ্রিক গ্রন্থনার সময় দেখা যাচ্ছে প্রতিটি খণ্ডকে আলাভাবে রাখা যাচ্ছে না। রাখলে একই কবিতা একাধিকবার এসে যাচ্ছে। সেই কারণে এই সংকলনে খণ্ডগুলিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো না। তবে মনে রাখার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে, বুক অব লভ প্রথম খণ্ডে মার্ক্স রেখেছিলেন বারোটি কবিতা। এর মধ্যে লুসিণ্ডা, উদ্বেগ, বিবর্ণা কুমারী এবং মানুষের গর্ব—এই চারটি কবিতা পরে যায় এ বুক অব ভার্সে। বুক অব লভ দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল বাইশটি কবিতা। এর মধ্যে নক্ষত্রের গান, এক নাবিকের সঙ্গীত কবিতা দুটি পরে সংকলিত হয় এ বুক অব ভার্সে। এই সংকলনেরই কবিতা আমার পৃথিবী,

অনুভব এবং রূপান্তরের কিছু অংশ ইংরিজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে জে. স্পারগো-র কার্ল মার্ক্স বইটিতে। য়েনীকে নিবেদিত সব থেকে বড়ো সংকলন হলো এ বুক অব সংস। এতে ছিল মোট ৫৩টি কবিতা। এর মধ্যে ইচ্ছা আন্তরিক, সাইরেন সঙ্গীত, বীণাবাদক দুই শিল্পী এবং সংহতি—এই কবিতা চারটি সংকলিত হয় এ বুক অব ভার্স-এ।

এ বুক অব ভার্স আসলে হয়ে দাঁড়ায় আগের বিভিন্ন সংকলনে স্থান পাওয়া কিছু কিছু কবিতা এবং উপন্যাস স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স ও কাব্যনাট্য অউলানেমের এক নতুন সংকলন। এরই মধ্যে দুটি কবিতা বেহালাবাদক এবং স্বপ্নময় ভালোবাসা ১৮৪১ সালে আথেনাউম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবিতকালে মার্ক্সের যাবতীয় সাহিত্য রচনার মধ্যে যা একমাত্র মুদ্রিত রচনা। বাকি সমস্তই পাণ্ডুলিপি হয়ে ছিল ১৯২৯ পর্যন্ত। কবিতার রচনাকাল কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা গেছে। সেখানে কবিতার নীচেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি সমস্ত কবিতা এবং কাব্যনাট্য ও উপন্যাসের রচনাকাল ১৮৩৬-এর শরৎ থেকে ৩৭-এর শীত পর্যন্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১৯৫৫ সালে মার্ক্সের পৌত্র এডগার লংগুয়েট-এর কাছ থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ইনষ্টিটিউট অব মার্কস ইজম-লেনিনিজম মার্ক্সের কবিতার দুটি পাণ্ডুলিপির সংকলন সংগ্রহ করেন। ১৯৬০ সালে মার্ক্সের প্রপৌত্র মার্সেল চার্লস লংগুয়েট ইনস্টিটিউটকে তৃতীয় একটি সংকলন দেন। ৬০ সালের পর থেকেই মার্ক্সের সাহিত্যচর্চার ওপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় টুকরো টুকরো হয়ে অনূদিত হতে শুরু করে।

য়েনীকে সনেটগুচ্ছ

১

নিয়ে নাও, তুমি নিয়ে নাও আমার সমস্ত গান
তোমার কাছে নত আমার সমস্ত ভালোবাসা,
যেখানে লিরার স্বরমধুর তান
হৃদয়ের উজ্জ্বল আলোয় নিত্য করে যাওয়া আসা।
আহা, যদি গানের প্রতিধ্বনি হোত আরও গভীর
যাতে দীর্ঘসময় থাকে মধুর আবেশ
যাতে নাড়ির স্পন্দন হয় আবেগ অধীর,
যেন তোমার গর্বিত হৃদয় ছুঁয়ে যায় দোলনার রেশ।
তখন আমি দূর থেকে শুধু দেখব
বিজয়ের দ্যুতি তোমায় কেমন করে নিয়ে যায়,
তখন আমি সংগ্রামব্রতী, আরও যেন দুর্ধর্ষ
আমার সঙ্গীত তখন ঊর্ধ্বমুখী, বলিষ্ঠ
আমার গান তখন অনেক, অনেক মুক্ত হয়ে বাজে
আর মিষ্টি শোকে লিরা আমার মিষ্টি করে কাঁদে।

২

আমার কাছে কোন আকাঙ্ক্ষাই পার্থিব নয়,
যা দেশ ও জাতিকে ছুঁয়ে যায় বহুদূর
তাকে রুদ্ধশ্বাস দাসত্বে আবদ্ধ করতে হয়
যার অনুরণন ছড়ায় সুদূর।
সে তোমার চোখ, যখন আলোতে মুখর
তোমার হৃদয় যখন উষ্ণ উল্লাসে ঝলকায়,
অথবা দুফোটা গভীর চোখের জল নীরব নিথর
সঙ্গীতের আবেগে নেমে আসে তীব্র যন্ত্রণায়।
আনন্দের সাথে আমি মুক্তি দিই এই প্রাণ
লিরার গভীর স্বরমধুর দীর্ঘশ্বাসে,
এবং ছুঁতে চাই একটি মহান মৃত্যুর ঘ্রাণ

প্রশংসিত লক্ষ্যের পথে,
অথচ নিতেও পারি সেই মান—
ধ্রুবসত্যের মতো তোমাদের মধ্যে আনন্দ-বেদনাতে।

৩

আহা, এই কাগজগুলো উড়ে যেতে পারে
আবারো জানাতে পারে কম্পিত স্বরে তোমায়,
আমার হৃদয় কেন যে বারবার ব্যথাতুর হয়ে পড়ে
অবাস্তব ভীতি এবং বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়।
আমার আত্ম-প্রতারণা ঘুরে বেড়ায়
রক্তের ভেতর, গভীরে শিরার
আমি ব্যর্থ, জিততে পারিনা হায়
সমস্ত আশা ধ্বসে পড়ে, ভেঙে ভেঙে চুরমার।
যখন ফিরে আসি দূর প্রান্ত থেকে
প্রার্থিত সেই প্রিয় কুটির,
মনে হয় কেউ তোমায় আলিঙ্গন করে যেন
আনন্দের সঙ্গে করমর্দন, সুন্দরতম,
তখন আমার ওপর বয়ে যায়
বিদ্যুতের মতো আলোর শিখা, বিস্ময় বিস্মৃতির।

৪

ক্ষমা করে দাও, প্রচণ্ড অবজ্ঞাভরে
আত্মার স্বীকারোক্তির তীব্র ইচ্ছা,
সঙ্গীতজ্ঞের ঠোঁট আগুনের মত জ্বলে
দৈন্যের শিখাকে দিতে চায় ঝাপটা।
নিজের বিরুদ্ধে কি দাঁড়াতে পারি আমি,
বধির, সুখহীন নিজেকে হারাতে
গায়কের নাম ভুলে যেতে পারি কি
তোমাকে দেখার পরও ভালোবাসা ফেরাতে?

হৃদয় রাখে এতই ব্যাপ্ত প্রত্যাশা,
আমার কাছে তুমি থাকো সীমানাহীন আকাশ,
আমি চাই তোমার চোখের জল
আমার গান যাতে পায় তোমার সাড়া
যাতে পায় তোমার অলঙ্কার উজ্জ্বল
তারপর চলে যেতে পারে, যেন ভেসে যাওয়া শূন্য বাতাস।
রচনা : অক্টোবরের শেষ দিকে, ১৮৩৬

য়েনীকে

১

শব্দ পড়ে থাকে ধূসর ছায়ার মতো, আর কিছু নয়,
জীবনকে ঘিরে থাকে চারদিক
তোমাতে, মৃত অথবা শ্রান্ত, আমার উদ্দাম প্রকাশ হয়
প্রাণ-প্রাচুর্যের, ছোটাব কি দিকবিদিক ?
যদিও পৃথিবীর ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে
মানুষের স্পর্ধা, দৃষ্টি রহস্যময় স্থির ;
এবং এই পৃথিবীর মানুষ চিরদিনই ছুঁয়ে গেছে
কাঙ্ক্ষিত উত্তাপ, শব্দের দুই তীর।
যদি আবেগ উত্থিত হয়, কম্পমান, বলিষ্ঠ নিথর,
প্রাণের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় ;
তীব্র দুর্ধর্ষতায় ছিন্ন করবে তোমার জগৎ,
সিংহাসন থেকে নামাবে তোমায় ;
উড়ে যাবে পশ্চিম বাতাস
এক নতুন পৃথিবী তখন জেগে উঠবে, ছুঁয়ে যাবে মুগ্ধ আকাশ

য়েনীকে

১

য়েনী! তুমি নিপাটভাবে খুঁজে দেখতে পারো
কেন আমি আমার গান দিয়েছিলাম 'য়েনীকে' স্মৃতিময়,

যখন শুধু তোমারই জন্যে আমার নাড়ির স্পন্দন তীব্র ধ্বনিময়,
যখন শুধু তোমারই জন্যে আমার নৈরাশ্যের হাহাকার
যখন শুধু তুমি পারো তাদের হৃদয়ে উত্তাপের সঞ্চার;
যখন তোমার নামের প্রতিটি অক্ষর স্বীকারোক্তি জানায়,
যখন তোমার প্রতিটি কথা তুমি ভাসাও সুরের আভায়,
যখন কোন মুহূর্তই বিচ্যুত হয়না ঈশ্বরীর নিঃশ্বাসের হাওয়ায় ?
কারণ এই নাম এতই প্রিয়, এতই মধুর,
যেন কবিতার ছন্দ, আমার কাছে নম্র-নিতুর,
এতই ব্যাপ্ত, উচ্চনিনাদী, প্রতিধ্বনিময়,
যেন দূর হৃদয়ের কম্পন,
সোনার তার বাঁধানো সিথার্নের হালকা আলাপন,
যেন বিস্মিত অস্তিত্বে আশ্চর্য জাদুময় !

২

দেখো !   আমি হাজার কেতাব লিখে যেতে পারি,
প্রত্যেক পংক্তিতেই যেখানে শুধু য়েনী এবং য়েনী,
তবুও গোপন থাকবে এক অন্য জগত, চিন্তায় লীন
এক শাশ্বত দলিল হৃদয়ের উত্তাপ এবং ইচ্ছা, পরিবর্তনহীন
মধুর কাব্য স্নেহেতে বিলীন,
তার সমস্ত আভা দ্যুতিময় ইথার
তার মনের সব দুঃখ, সমস্ত স্বর্গীয় আনন্দের উৎসার
তার জীবন তার অস্তিত্ব সমস্তই আমার ।
আকাশের সমস্ত তারার মধ্যে আমি তা পড়তে পারি
পশ্চিম বাতাস থেকে ফিরে আসে, আমার কাছে
ফিরে আসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ধ্বনির মতো
সুরের মতো পাশাপাশি আমি তা লিখে যেতে পারি
আগামী দিন যাতে দেখতে পারে, সেই প্রত্যাশা
ভালোবাসা যেন য়েনী, য়েনী মানেই ভালোবাসা ।

রচনা : ১৮৩৬, নভেম্বর
১৯৬২-তে রুশ পত্রিকা ইনোস্ত্রান্যায়া
লিতারেতুরা-র প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

আমার পৃথিবী

আমার কাছে চিরদিনের নয় পৃথিবী, নয় স্থির,
অথবা জাদুকরী পবিত্রতার ঈশ্বর ;
এদের সবার ওপরে আমার ইচ্ছে, শানিত তীর,
বুকের মধ্যে বয়ে যায় তার দুরন্ত ঝড়।
নক্ষত্রের উজ্জ্বল প্রভা গ্রহণ করেছি আমি,
সূর্যের সমস্ত আলো,
তবুও আমার বেদনা তার প্রার্থনা রাখে জানি।
আমার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেলো।
তাহলে ! নিরন্তর সংগ্রাম, কঠোর প্রয়াসে,
জাদুদণ্ডের মতো উপস্থিত দাঁড়িয়ে
ধূসর কুয়াশায় নিষ্ঠুর শয়তানের বেশে
কিছুতেই পারিনা এগোতে সেই লক্ষ্যে
কিন্তু এ যে শুধু ধ্বংস, নির্জীব প্রস্তর
ঘিরে ধরে, গ্রাস করে আমার স্পৃহা,
যেখানে ঝিকিমিকি স্বর্গীয় উজ্জ্বল নির্ঝর
দীপ্যমান থাকে আমার প্রত্যাশা।
সে-তো কিছুই নয়, শুধু সংকীর্ণ পরিসরে
সঙ্কীর্ণ যত ভীতু কাপুরুষের বেশ,
দাঁড়িয়ে থাকে আমার স্বপ্নের সীমান্তে
আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ।
য়েনী, তুমি কি বলতে পারো আমার ভাষা,
কি তার অর্থ ?
আহা, তারও কোন প্রয়োজন নেই ভাবা,
আবার বলাও ব্যর্থ।
তোমার উজ্জ্বলতর দুটি চোখের দিকে তাকাও,
স্বর্গের আকাশের থেকেও যা গভীর ;
নিষ্প্রভ যার কাছে সূর্যের স্তম্ভিত আলোও
সেইখানে আছে উত্তর সুস্থির।
হতে গিয়ে সুন্দর এবং আনন্দে উচ্ছল

শুধু নিঃশব্দে রাখো তোমার শুভ্র হাত ;
তুমি নিজেই পাবে উত্তর উতরোল
আমার ঠিকানা দূর দেশের প্রাসাদ ।
আহা, যখন তোমার ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে আমার উদ্দেশে,
শুধুই একটি উষ্ণ কথা ;
আমি ভেসে যাই উন্মাদ উল্লাসে,
হারিয়ে যাওয়ার অসহায় নীরবতা ।
হায় ! তবুও আমি দৃপ্তস্থির কর্মে ও প্রজ্ঞায়
আমার প্রাণের নিশীথে,
যখন শয়তানের মতো সেই জাদুকর ভয় দেখায়
গর্জন ও বিদ্যুতে ।
তবুও শব্দরা কেন তাড়া দেয় শিরায়
প্রবাহের শব্দ তুলে, কোন ধূসর আচ্ছাদন
যা অসীম, ইচ্ছার নিগূঢ় ব্যথায়
তোমার অথবা প্রত্যেকের মতো ।

রচনা ঃ অক্টো-ডিসে, ১৮৩৬

অনুভব

কিছুতেই পারি না শান্তিতে থাকতে
আত্মার যেখানে নিমজ্জন,
কোন কিছুই সহজে পারে না হতে,
আমি অবশ্যই দিতে পারি বিশ্রাম বিসর্জন ।

ওরা শুধু জানে উল্লাস
সব কিছু যখন সহজেই ঘটে যায়,
আত্ম-অভিনন্দনের স্বাধীন প্রকাশ,
প্রতি মুহূর্তে রাখে প্রার্থনা, ধন্যবাদ জানায় ।

অথচ তীব্র বিরোধ নিয়ে আমি আছি মেতে
নিরন্তর উত্তেজনা, অশেষ স্বপ্ন ;
জীবনের সাথে পারি না মিলে যেতে,

যাবো না সেই পথে, সেই স্রোত-মগ্ন।

স্বর্গকে আমি গ্রাস করতে চাই,
চাই পৃথিবীকে আমার কাছে টেনে নিতে ;
ভালোবাসা এবং ঘৃণায় আমার সংকল্পের ঠাঁই
আমার নক্ষত্র যখন ঝলমল করে জ্বলে ওঠে।

সমস্ত কিছুই আমি চাই জয় করতে,
ঈশ্বরের মুগ্ধ আশির্বাদ ;
জ্ঞানের অন্তিম নিহিতে
শিল্প ও সঙ্গীতের আস্বাদ।

আমি ধ্বংস করে ফেলব পৃথিবী এই
যেহেতু আমি কোন পৃথিবীই গড়তে পারি না,
যেহেতু আমার ডাকে তাদের কোন সাড়া নেই
জাদুর ঘুর্ণীতে মূক, যেন কেউ কিছু জানে না।

নিষ্প্রাণ নির্বাক, স্থির হয়ে থাকা দৃষ্টি
যেন আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় অবজ্ঞা,
যেন আমরা হারাই আমাদের কৃষ্টি—
মন নেই, বারবার শুধু পথে পথে ফেরা।

যদিও তাদের ভাগ্যের অংশীদার আমি কখনই নই-
জোয়ারের স্রোতে ভেসে যায়,
থাকে না আবহমান গতিতে কিছুই,
আড়ম্বর, অহমিকা, কোলাহলে লোপ পায়।

তীব্রগতিতে আসে পতন, আসে ধ্বংস
ভেঙে পড়ে অট্টালিকা, দুর্গ-প্রাকার ;
শূন্যে লীন তাঁদের অস্তিত্ব,
যখন শিঙা বাজে আর এক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার।

সুতরাং এই হয়, যুগের পর যুগ,
নির্জনতম থেকে স-জন,
শৈশব থেকে মৃত্যু

শুধু অসংখ্য উত্থান-পতন।

আত্মারা অতএব পথে চলে নিজেদের
যতক্ষণ হয় না ক্ষয়,
যতক্ষণ তাদের প্রভু এবং মনিবের
নির্দেশ আসে নিষ্ঠুর লয়।

তাহলে এসো, আমরা পার হই নির্মম সাহসিকতায়
ঈশ্বরের সেই স্থির-পূর্ব প্রান্তর,
দুঃখ এবং আনন্দের উচ্ছ্বলতায়
ঐশ্বর্যের সংগীত বাজে নির্ঝর।

তাহলে এসো, মুখোমুখি হও ঝড়ের
নয় বিশ্রাম, নয় ক্লান্তি নিয়ে,
নিরানন্দ অথবা ভয়ের,
কাজহীন নয় অথবা আশাকে বাদ দিয়ে ;
নয় শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবা
কষ্টের অথবা বেদনার পায়ে মাথা রেখে,
আমাদের ইচ্ছে, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা
নিশ্চিত জেনো, অপূর্ণই রয়ে যাবে।

অক্টো-ডিসে, ১৮৩৬
প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশ ১৯৭৫

রূপান্তর

আমরা চোখ যেন ঝাপসা, বিভ্রম দৃষ্টি,
        লাল হয়ে আছে ফ্যাকাশে,
মস্তিষ্ক নির্বাক হতবুদ্ধি,
        যেন আছি রূপকথারই রাজ্যে।

আমি দুরন্ত স্পর্ধায় চাই দাঁড়াতে
        সমুদ্রপথের যাত্রী,

হাজার বাধার পাহাড় যেখানে মাথা তুলে আছে,
বন্যায় ভেসে যায় দিনরাত্রি।

আমার চিন্তা উড়ে যায় বহুদূর,
তাদের ডানায় ভর দিয়ে,
এবং যদিও গর্জন করে ক্রুদ্ধ ঝড়,
আমি সমস্ত বিপদকে দিই নিভিয়ে।

আমি তো কুণ্ঠিত নই সেখানে,
স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
ঈগলের মতো শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে
যাত্রার শেষ সীমান্ত।

এবং যদিও কিন্নরী আবেশে জুড়ায়
তার মুগ্ধময় সঙ্গীত
যা দিয়ে সে হৃদয় জয় করে নেয়—
তবুও আমি থাকি নিষ্কম্প ঋত্বিক।

আমি ফিরিয়ে নিই শ্রবণের দ্বার
যা কিছু মিষ্টি স্বর, তার থেকে
ফুলে ফুলে ওঠে বুক আমার
একটি মহৎ পুরস্কার পেতে।

হায় রে! তরঙ্গ তীব্রগতি হয়,
কিছুতেই হয়না শ্রান্ত;
ঝড়ের মতো সব উড়িয়ে নেয়
মুহূর্তেই দৃষ্টিতে নিষ্ক্রান্ত।

জাদুশক্তি এবং শব্দের ব্যবহারে
আমি তৈরী করি জাদুমন্ত্র,
সম্মুখে তরঙ্গ গর্জন করে,
যতক্ষণ হয়না অতিক্রান্ত।
এবং বন্যায় যখন আমূল বিধ্বস্ত,
দৃষ্টি লুপ্তপ্রায়,

আমি হারিয়ে যাই নিজের অস্তিত্ব থেকে,
তামসীর কুয়াশায়।

এবং যখন আমি আবার উত্থিত হই
অপ্রস্তুত পরিশ্রমে বিধ্বস্ত,
আমার তখন কোন শক্তিই নেই,
হৃদয়ের উজ্জ্বলতাও নিঃশেষিত।

বিবর্ণ, কম্পমান, আমি
বুকের ভেতর থাকি স্থির তাকিয়ে
কোন সংগীত ওঠে না বেজে, অথবা স্বরধ্বনি
আমার বেদনাকে ছায়া দিতে।

আমার গানে মুছে যায়, হায় রে
শিল্পে হারিয়ে যায় কোন অরণ্য
কোনও ঈশ্বর দেয়না ফিরিয়ে
মৃত্যুহীনতার লাবণ্য।

সৈন্যদুর্গ গেছে ডুবে
যা দাঁড়িয়ে ছিল স্তম্ভিত মিনার ;
অগ্নিময় জৌলুষ তার গেছে নিভে
শূন্য হয়ে যায় হৃদয়ের আধার।

তখন শুধু তোমার দ্যুতি ছড়ায়
আত্মার শুদ্ধতম বিভাস
নৃত্যের পর নৃত্যের পাখায়
পৃথিবীকে ঘিরে স্বর্গের আকাশ।

সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই,
স্বচ্ছ হয় কল্পনা,
আমি আপন করে খুঁজে পাই
আমার সংগ্রামের সীমানা।

হৃদয় আরও গম্ভীর হয়ে বাজে, আরও স্বাধীন,
আন্দোলিত বুকের গভীরে

বিজয়ের আনন্দে উড্ডীন,
প্রশান্তির তীব্র সুখে।

সেই মুহূর্তে হৃদয় আমার
উল্লাসে যায় উড়ে
আর আমি যেন এক জাদুকর
যার নির্দেশ মতো সে চলে।

মত্ত ঢেউ আমি ছুঁড়ে দিই
ধ্বংসের মতো বন্যা
খাঁড়া পাহাড়ের শীর্ষেই
তবুও ঔজ্জ্বল্যে সে অনন্যা।

আমার আত্মা আর হয়না ক্ষুব্ধ
হারায় না পথ ঝঞ্ঝায়
আমায় হৃদয় হয় স্তব্ধ
তোমার চাহনীতে, মুগ্ধ ভালোবাসায়।

নভেম্বর ১৮৩৬ থেকে
ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭-এর মধ্যে লেখা
প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশ ১৯৭৫

আমার পিতাকে

১

সৃষ্টি

সৃষ্টিশীল আত্মা সৃষ্টির বাইরে
ভেসে যায় তরঙ্গে দূর বহুদূরে,
পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হয়, জীবন জন্ম নেয়,
তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয় নিঃসীমে।
তাঁর প্রশান্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে অনুপ্রাণ,
জলন্ত মশালে, সংবদ্ধ আত্রাণ।

শূন্যতা স্পন্দিত হয়, আর গড়ায় সময়
গভীর প্রার্থনায় তাঁর মুখের ছায়ায় ;
শব্দে ভাঙে সৌরজগত, উল্লসিত হয় সমুদ্র-বন্যা
সোনালী নক্ষত্র দ্রুত হেঁটে যায়।
তিনি আশীর্বাদ আঁকেন সংকেতে,
সকলে সিক্ত হয় পবিত্র আলোকপাতে।
মননের নিঃশব্দ সীমায়, শাশ্বতের বাণী
ধীরে ধীরে ছড়ায়, উজ্জ্বল প্রতিফলনে,
যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্র বোধ আনে আদিম
আবেশ, কবিতার অনুরণনে।
তখনই সহস্র যোজন দূর থেকে বজ্রের শব্দের মতো
ভেসে আসে স্বর, সৃষ্টির পূর্বশ্রুত ঘোষণায় ঃ
''নক্ষত্রেরা এখন স্নিগ্ধ আলোয় ভরপুর,
প্রস্তর-মৃত্তিকার জগত বিশ্রাম-ক্লান্ত ;
আমার আত্মার প্রতিবিম্ব তুমি,
আত্মার নবআলিঙ্গনে উদ্বেল হও ;
উৎক্ষিপ্ত অন্তর যখন তোমার দিকে যায়,
আনন্দ ও ভালোবাসায় মূর্ত হয়ে ওঠো।
''শুধু ভালোবাসার কাছেই নিজেকে উন্মুক্ত করো ;
শাশ্বতের চিরন্তন আসন,
যেমন তোমাকে আমি দিয়েছি,
মুক্ত করো অন্তরের আলোক-বিচ্ছুরণ।
'একমাত্র সংহতিই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এর মতোন,
একমাত্র আত্মার সঙ্গেই হতে পারে আত্মার বন্ধন।'
আমার মধ্যে তোমার হৃদয় ধিকিধিকি জ্বলে
হাজার অর্থের বিভিন্ন ভঙ্গীতে ;
তুমি ফিরে যাও স্রষ্টার কাছে
মুছে যায় প্রতিচ্ছবি সেই সাথে ,
মানুষের ভালোবাসার আগুনে দগ্ধ হয়ে
তুমি মিশে যাও তাঁর মধ্যে, আর সে আমাতে।"

২

কবিতা

ঈশ্বরের মতো অগ্নিশিখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
আমাতে প্রবাহিত হয় তোমার বক্ষ থেকে উঠে,
দূর সুউচ্চে উঠে শিখারা পাখা ছড়ায়,
আমি তা লালন করি আমার বুকের ছায়ায়।
বাতাস-দেবতা ঈউলুসের মতো তোমায় তখন লাগে
ভালোবাসার পাখা দিয়ে আগুনকে রাখো ধরে।

আমি দেখি সেই রক্তিমাভা, শুনি শব্দ,
ওপরে স্বর্গ, আরো ওপরে নির্মল পরিব্যাপ্ত,
কখনও উঁচুতে উঠে যায় আবার নেমে আসে,
নামে আবার ওপরে ছড়াতে।
অবশেষে এই বিক্ষোভের অবসান, প্রশমিত হয় ঝড়,
বিষণ্ণতা ও আনন্দে বাজে সঙ্গীত, আমার মুগ্ধস্বর।
এইভাবে উষ্ণ ঘনিষ্ঠতার, নরম আবেশে
থাকে জীবন, থাকে আত্মা যাদুমন্ত্রের বন্ধনে,
আমার মন থেকে ভেসে যায় ছায়া
তোমার ভালোবাসার অগ্নিস্পর্শে।
ভালোবাসার মূর্তি তখন আরো দীপ্ত হয়,
আমার মাধুর্যে স্রষ্টার হৃদয়।

অরণ্যের বসন্ত

আমি পথ হারাই ফুলের অরণ্যে
সুবর্ণালোকে ঝলকায় বসন্ত যেখানে
মাথার ওপর শনশন ধ্বনি
হাল্‌কা হাওয়ায় গাছের মাথা দোলে।
যেন তার ক্ষিপ্র গতি
যেন তার ক্ষিপ্র গতি
আগুনের মতো জ্বলে মিষ্টি ছায়ায়
সমুদ্র আর বাতাসের ঝাপটায়।

কিন্তু যখন ছিন্ন করে তা মাটির বন্ধন,
পাথরে কেঁপে ওঠে তার ক্রুদ্ধ গর্জন।
জলে ওঠে ঘূর্ণীর মতো ঘুরে
কুয়াশার বৃত্তে, নীরবে নিঃশব্দে।
ফুলবীথিকার পথে আবার ফিরে আসে,
মৃত্যুবেদনার গভীর নিঃশ্বাসে,
সারি সারি গাছ দীর্ঘকায়
মৃদু বাতাস, স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়।

জাদুবীণা

একটি ব্যালাড

এমনই মুগ্ধ শ্রুতিময় তার তান
শিহরিত বীণার মতো, তন্ত্রী কম্পমান
চারণের মতো ঘুম ভাঙায়।
কেন এত ভক্তি নিয়ে হৃদয়ে আঘাত করে
কোন সেই শব্দ, সমবেত সুরে
যেন নক্ষত্র এবং আত্মার কান্নায়।

সে জাগে, শয্যা থেকে ওঠে,
মাথা রাখে ছায়ার দিকে
চেয়ে দেখে সোনার কঙ্কন।
এসো, হে চারণ, পা রাখো উঁচু-নীচুতে,
বাতাসের চূড়ায়, মাটির বুকে,
তুমি ছুঁতে পারো না সেই তন্ত্রীর কাঁপন।

সে দেখে তার উন্মিলন, যেন ক্রমশঃ ছড়ায়,
হৃদয় আকুল হয় তীব্র যন্ত্রণায়,
শব্দের তরঙ্গ ভাসে বাতাসে।
সে দেখে এবং ক্রমশঃ প্রলোভিত হয়ে পড়ে
ভৌতিক উঁচু-নীচু তল দৃষ্টির বিভ্রমে,
সর্বত্র সে দেখে যেখানে-সেখানে।

থেমে যায় সে, দেখে উন্মুক্ত এক দরোজা
ভেতর থেকে আসে সঙ্গীত, সুরমূর্ছনা
তাকে নিয়ে যায়,
স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে লিরা একটি
শুধুই বেজে চলে, অবিরাম, অবিশ্রাম, দিনরাত্রি,
অথচ কেউ নেই যে বাজায়।

তাকে আকাঙ্ক্ষার মতো পেয়ে বসে, ব্যথার মতো গ্রাস,
অনুভূতি হারায়, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস
বিদ্ধ করে যতিহীন,
লিরা আমার মন থেকে বাজে,
এ যে আমার, শুধু আমারই শিল্পের সাজে
হৃদয় থেকে আসে অন্তহীন।

প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে সে তন্ত্রীকে স্পর্শ করে
পর্বত উত্থানের মতো স্বরের কম্পন জাগে
নীচে নেমে আসে যেন অতল সমুদ্র
তার রক্ত জেগে ওঠে, তীব্র স্বরে গান গায়
এমন তীক্ষ্ণ হয়নি কখনও ইচ্ছার যন্ত্রণায়
চোখ থেকে মুছে যায় তার পৃথিবীর অস্তিত্ব।

অপহরণ

একটি ব্যালাড

যোদ্ধা সে, লোহার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চুপ,
রমণী, অদ্ভুত সুন্দরী, অপরূপ।
'প্রিয় বীর, আমি কি আসতে পারি তোমার কাছে?'
চারদিক তখন শুধুই নিঃশব্দ, অন্ধকার ঘিরে আছে।

'আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি, মনে হয়
তোমার মুক্তির নিশ্চিত পরিচয়।
সেখানে তুমি শেষভাগ কঠিন করে বাঁধো,
তারপর দড়ি বেয়ে নিশ্চিন্তে নেমে এসো।'

'হে বীর, তোমার কাছে চুপি চুপি পৌঁছই আমি,
হে বীর, ভালোবাসার জন্যে আমি সব পারি!'
'প্রিয়তমা, নিয়ে নাও সবকিছু যা তোমার নিজস্ব,
আমরা ছায়ার মতো পার হবো, নৃত্যের তালে এই বৃত্ত।'

'বীর আমার, অন্ধকার ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়,
আমার অনুভবে গ্রাস করে যাত্রার তীব্র ভয়!'
'তাহলে তুমি প্রত্যাখ্যান করো, যখন আমি বিপদের মুখোমুখি
আর তুমি শুধুই কাতর, অহেতুক ভয়ের ফাঁকি!'

বীর আমার, প্রিয়তম, তুমি শুধু আগুনের সাথে করো খেলা,
তবুও তুমিই আমার নায়ক, নির্জন হৃদয়ের সারাবেলা!
বিদায় হে প্রাসাদ, চিরদিনের জন্য,
যেখানে আর পড়বে না কোনদিনও আমার পায়ের চিহ্ন।

'আমাকে যা প্রলোভিত করে আমি কিছুতেই পারি না ঠেকাতে,
তোমরা সবাই আমায় ভালোবেসেছিলে, আমি চাই বিদায় জানাতে!'
আর সে দ্বিধা করেনা, নেই বেশি সময়
রজ্জুর পাথায় ভর করে নেমে আসে মাটির সীমানায়।

যখন সে মাঝপথে নেমে আসে
সহসা আতঙ্ক জাগে, বিভ্রম দৃষ্টিতে,
বাহু যেন দুর্বল, এই বুঝি পতন ঘটায়,
নীচে, বহু নীচে যেখানে মৃত্যু আছে অপেক্ষায়।

'প্রিয়তম বীর আমার, একবার শুধু চাই তোমার কথা শুনতে
আমি আনন্দে মরতে পারি তোমার বাহুর বন্ধনে।
তোমার আলিঙ্গন আমি নিঃশ্বাসে নিতে চাই
তারপর মধুর শূন্যতায় শুধু হারিয়ে যাই।'

যোদ্ধা তুলে নেয় তার শিহরিত দেহ
বুকের কাছে চেপে ধরে দীপ্ত ভালোবাসায়, উষ্ণ স্নেহ
এবং তাদের হৃদয়ের গাঢ়তায়
যোদ্ধার মন ব্যথাতুর হয় মরণের যন্ত্রণায়।

'বিদায় ভালোবাসা আমার, এতই সত্য, এতই মধুরতা !'
'স্থিত হও, শুরু হোক আমাদের যাত্রা !'

যেন একটি চমক, শাশ্বত অগ্নির মতো ভাষায়
একটি মুহূর্ত শুধু, যখন তাঁরা অন্ধকারে হারায়।

ইচ্ছা আন্তরিক

একটি রোমান্স

'তোমার বুক কেন ভরে আকাঙ্ক্ষায়, চোখ দুটি ঔজ্জ্বল্যে,
কেন তোমার শিরায় আগুন ছুটে বেড়ায়,
যেমন রাত্রি গভীর হয়ে নামে, ধীর অনিবার্যতার ভাগ্যে
মুখর তোমার ইচ্ছার সীমানায় ?'

আমাকে নয়ন দুটি দেখাও, মধুরিম ধ্বনির মতো,
রামধনুতে রঙ ছড়ায়
যেখানে আলোক উজ্জ্বল স্রোতস্বিনী, স্থুর তরঙ্গায়িত,
নক্ষত্রেরা সাঁতার দিয়ে জল কাঁপায়।

'আমি এই স্বপ্নই দেখি, এতই কষ্টময়,
অতীত যেখানে পরিষ্কার।
আমার মস্তিষ্ক ঘিরে থাকে শূন্যতা, অবশ হৃদয়
কাছাকাছি অপেক্ষায় আমার মৃত্যুর আধার।'

'তুমি কি ভাবো এখানে, সেখানে, কোন স্বপ্ন,
কে তোমায় দূর দেশে নিয়ে যায় ?
এখানে ভাটাতে জোয়ার নামে, আশায় শুধু মগ্ন,
এখানে আগুন জ্বলে নিখাদ ভালোবাসায়।

এখানে মূল্যহীনও অসামান্য, এখানে নেই কোন উত্তেজনা,
কিন্তু যা আছে অস্পষ্ট আলোক অল্প দূরে,
তাতেই আমি দৃষ্টিহীন, প্রাপ্তির প্রকল্পনা,
আমায় ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

অনেক উঁচুতে উঠে যায় সে, ঝিকমিক করে তার চোখ,
প্রতিটি অঙ্গ তার কেঁপে ওঠে,
তার পেশী দুলে ওঠে, হৃদয়ে আলোক,
ছিন্ন হয় দেহ, আত্মার পরিত্যাগে।

বের্লিনে ভিয়েনার নাটক

১

'দর্শনার্থীরা ঠেলাঠেলি করে, পরোয়া করে না আঘাত
তাল্‌মা আছেন, সংগীত দেবীর প্রাসাদ।'
ওহে বন্ধুগণ, শাণিত অস্ত্র করে না আকর্ষণ
এযে মিলনান্ত—আগুনেয়দের অনুষ্ঠান।

২

আমি দেখি তাদের নানারকম কসরৎ, ভঙ্গী কায়দার,
তাদের প্রদর্শন। মন্দ নয়। যথেষ্ট মজাদার।
আশ্চর্য স্বাভাবিক—শুধু একটি জিনিস নেই,
হুবহু তাই হয়ে যাবে, যদি একবার—লাগিয়ে দিই।

হঠাৎই কে যেন আমার জামা ধরে টানল চুপচুপ,
সত্যি বলছি, খুবই সুন্দর কৌতুক।
এক যুবতী মুগ্ধ হয়ে গেল দেখে
বন্দী হোল আগুনেয়র বন্ধনে, লুটিয়ে পড়ল তার বুকে।
নিমীলিত চোখ, ভীরুতার স্বরে বলে
হে গভীর হৃদয় বেদনার করতলে।
হে মুগ্ধমন্ত্রসুর, উজ্জ্বল শোক!
আমাকে আকৃষ্ট করে সে, আনন্দময়লোক!
মনে হয় কি নিগূঢ় টানে আমি আকর্ষিত
সে আমায় নিয়ে খেলা করে; আমি তাকে ভালোবাসি, বিমূঢ় স্তম্ভিত।
হে আগুনেয় বলো, আমি তোমাতে
আমি নিঃশ্বাস নিতে পারিনা, মস্তিষ্কও ক্লান্ত তাতে।

এলোমেলো

১

আমিও চাই কিছু বিনোদন, তবুও
খরচ করিনা এক পয়সাও,
রাস্তার আলোয় ফ্রক কোটখানা কাঁধে ফেলে,
ঢুকে পড়ি কাছাকাছি কোন হলে।
যা চেয়েছিলাম, তার থেকেও করুণ
কি আমি করতে পারি, কোন্ শপথ উচ্চারণ।
আমি অবশ্যই চাই তখন সঙ্গীতের সেই
স্বরলিপি। 'আমার হাত ঠাণ্ডা', ক্রুদ্ধ হই;
'বেশ তো দস্তানা পড়ো', মহিলাটি উচ্চস্বরে বলে,
'মাদাম, তারা আমার শিরায় ঘোরাফেরা করে।'
সে অনাবৃত করে তার কাঁধ, তার বুক, তার আর সবকিছু,
তার শীতের চাদরের দিকে আমার দৃষ্টি দিতে বলে শুধু।
আমি তাকে বলি 'আগুন ধিকিধিকি জ্বলে,
কাঁচা মাংস দেখলে আমার ঘুর্ণিরোগ ধরে।'
চীৎকার করে সে, 'ওঃ, ব্যালে কি পবিত্র নয়!'
আমি বলি, 'ওহে ঈশ্বর, এমন কিছু কি আছে তোমার কাছে
যা আছে এরই মাঝে।'

২

আমি চুপচাপ বসে থাকি, কেটে যায় সুর আঁকাবাঁকা।
সে অবজ্ঞা করে, ভাবে লোকটা আশ্চর্য বোকা।

নিয়োগশর্ত

মনিব গিন্নী : তাহলে, তোমার কি বক্তব্য?
দাসী : খুবই সাধারণ। শুধু একটি মাত্র—
এড়াতে পারিবারিক কলহ
প্রতিমাসে আমার একবার আসবে অতিথি,
চায়ের, অতি অবশ্য

অভিমানী আত্মা

কসাই একটা বাছুরকে জবাই করছে, তারা কাঁদছে।
যন্ত্রণায় চিৎকার করে যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্ত শুকিয়ে আসে।
ওরা হাসে। হায় স্বর্গ, কি ভীষণ রকমের
অদ্ভুত এই প্রকৃতি। দাড়ি নেই কোন কুকুরের।

কেন এই প্রলাপ, যেন সূর্যরশ্মির থেকে উদ্ভব
আমরা তো জানি, একবার ডেকেও উঠেছিল বালামের গর্দভ।

রোমান্টিসিজম...

যে শিশু গ্যয়টেকে চিঠি লিখেছিল একবার,
যেন তাকে সে ভালোবাসে, এমনই ভঙ্গিমায়,
নাট্যশালায় গেল একদিন।
দৃষ্টিতে আসে এক পোশাক রঙীন,
পায়ে-পায়ে কাছে আসে, মিষ্টি হাসি।
'মহাশয়, বেট্টিনা আপনারই শুভেচ্ছার্থী
মাথা রেখে আন্তরিক ইচ্ছে তাব মনের ভেতর
তার কোঁকড়ানো চুল আপনার বুকের ওপর।'
উত্তর দেয় নীরস কণ্ঠে
'বেট্টিনা, এ তো আমার নয়, তোমার ইচ্ছে।'
'প্রিয়তম', সে বলে তৎক্ষণাৎ,
'আমার কেশ উৎকুনহীন, আপনি এতই নিশ্চিত।'

সত্যের সূর্যকে

বাতিদান আলো দেয়, জ্যোতি ছড়ায় নক্ষত্র,
হৃদয়ের গভীরে আছে দ্যুতি, ঝিকমিক করে সৌন্দর্য,
আত্মার প্রভা, উজ্জ্বল দীপ্তি—
কখনই যায় না দেখানো
সত্যের সূর্যকে যেমন পারো।
প্রত্যেক কর্মেরই যেমন আছে স্বামী

সত্যের সূর্য তুমি নিজেকেই বলতে পারো
তবুও এও ঠিক, সূর্যকেও তো হয় ছায়া দিতে।

এক যোদ্ধা নায়ককে মনে রেখে

এখানে খোঁজো, সেখানে খোঁজো, খুঁজে বেড়াও যেখানেই
অবাক হয়ে দেখবে তুমি, যোদ্ধা এবং নায়ক, উঠে আসে দুজনেই।
তার নাচ, তার কথা সবকিছুই ঠিকঠাক আধুনিক,
তবু প্রতিরাতে তাকে দংশন করে সেই কীট পৌরাণিক।

রাস্তার ওপারের প্রতিবেশিনীকে

সাগ্রহে আমার দিক তাকিয়ে থাকে সামান্য দূর থেকে,
ঈশ্বর আমি কিছুতেই পারিনা তার সামনে দাঁড়াতে।
একটি ছোট মানুষ, একটি হলুদ বাড়ী,
আর শীর্ণকায়া একটি নারী
সমস্ত উৎসাহই হাওয়ায় যায় মিলিয়ে,
এর থেকেও ভালো ছিল অন্ধকারের গভীরে।

সাইরেন সঙ্গীত

একটি ব্যালাড

তরঙ্গ মৃদু ধ্বনি তোলে,
বাতাসের সাথে খেলা করে,
মাঝ দিয়ে শূন্যে হারায়।
তুমি তার কম্পন দেখো, বাতাসে ওড়া,
এদিক থেকে ওদিক, শূন্য থেকে নীচে নামা,
জরুরী সংকেতের পাখায়।

শিরাকে তারা ধরে তীব্র কম্পনে
স্বর্গীয় উৎসবে,
পবিত্র দ্যোতনায়।
মৃন্ময় অন্ময়কে কাছে টানে তারা

কাছে টানে পৃথিবী, দূরে নীহারিকা,
সঙ্গীত সুরের মূর্ছনায়।

তার শব্দ এমনই আশ্চর্য মধুরিম
কেউ রাখেনা প্রতিবাদ, নিঃশঙ্ক গহীন
ছড়ায় শুধু সৌরভে।
যেন সেই মহান স্থিতধী আত্মা
প্রলোভনে জয় করে তার শ্রোতা
কালচে-নীল সমুদ্রের প্রতিবিম্বে।

যেন সেখানে দোলে, জন্ম নেয়
তরঙ্গের থেকে এক পৃথিবী, যা বয়ে যায়
গভীর স্বরে গোপনভাবে।
যেন জলের অতলতায়
দেবতারা থাকে নিদ্রায়
কালচে-নীল সমুদ্রের বুকে।

কাছেই ছিল এক ছোট্ট নৌকো,
তরঙ্গরা শুনে মুগ্ধ হলো
এক সৌম্য চারণের গান
এমনই তাঁর দৃষ্টি, স্পষ্ট, নিষ্কম্প,
তাঁর সুরধুনী এবং প্রতিবিম্ব
আশা এবং ভালোবাসার নেয় তান

গাঢ়তায় ব্যাপ্ত হয়
নিদ্রিত জলদেবীরা
যোগ দেন তাদের সঙ্গীতপ্রিয়তায়।
তরঙ্গেরা শব্দ তোলে
লিরার সুরের তালে তালে
বাতাসের সাথে নেচে বেড়ায়।

কিন্তু শোনে দুঃখের সংযম
সংকেতের মতো তীক্ষ্ণ
মধুর স্বরের মাত্রায়।

কবি কাঁপে
ঈশ্বরীরা ঝিকমিক করে
শব্দ এবং ভালোবাসায়।

হে যৌবন, ওঠো, কাজ করো,
সমুদ্রকে আনো বশ্যতায়
তুমি যা চাও, তা অনেক উঁচু জেনো
তোমার বুক দোলে উল্লসতায়।
তোমার সৌখীন জলমিনার
তোমার গান বিমুগ্ধ করে
যখন নামে তীব্র জোয়ার
তখনও তোমার স্বর ওঠে।

উজ্জ্বল ক্রীড়াময় তরঙ্গ তাকে তোলে
ছুঁড়ে দেয় আরও উঁচুতে দৃপ্ত আবেগে।
চোখ উজ্জ্বলতর, আশার শিখায়
বারবার আকাশকে মেপে দেখে।

আমাদের হৃদয়রাজ্যে দেখো ঢুকে
এক হারানো ম্যাজিক পাবে তোমার মন
তরঙ্গরা শুধুই নাচে, গান গায় এখানে
সত্যি ভালোবাসার যন্ত্রণার মতো রাখো উচ্চারণ।

পৃথিবী আসে মহাসমুদ্র থেকে
জীবন উত্তাল জোয়ারে
সীমাহীন উজ্জ্বলতায় উঠতে চায় সে
যেখানে সবকিছুই শূন্যতায় ভরে।
যেন এই স্বর্গ, এই তারাদের মুখ
সে তাকিয়ে দেখে, চির ঔজ্জ্বল্যে
অনেক নীচে তরঙ্গের বুক
নৃত্যশীলা নীল ঢেউ-এর তালে।

বিন্দুর মতো, তীক্ষ্ণতায়, কম্পনে
পৃথিবীকে করে মহীয়ান,

জীবন-আত্মার ঘুম ভেঙে ওঠে ;
ভেসে যায় স্রোতের উজান।

সবাইয়ের আন্তরিক ইচ্ছায়
তুমি নিঃশেষ হও সঙ্গীতে ?
লিরার স্বর কি তোমার ঘুম ভাঙায় ?
তুমি কি উদ্ভাসিত হও স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্যে ?
তাহলে আমাদের কাছে নেমে এসো
বাড়াও তোমার দুটি হাত
তোমার হৃদয় দিয়ে ছুঁয়ে দেখো
তুমি পাবে এক ব্যাপ্ত জগত।'

তারা সমুদ্র থেকে জাগে,
কেশ তাদের পশমের মত ওড়ে,
শিয়র শায়িত থাকে বাতাসে।
চোখ জ্বলে আগুনের মতো,
ঠিকরে পড়ে বিস্ফোরণে. লিরাব সুব ততো
ঝিকমিক ঢেউ-এর তালে ভাসে।
গভীর চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে,
যুদ্ধ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে
উঁচুতে ওঠে, অনেকে উঁচুতে,
গর্বে সে চোখ মেলে,
নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বে,
সহসা শোনে সেই সংকেত।

নীচে তোমার হিম নিরন্ধ্রে
কিছুই নেই যা উঠতে পারে আকাশ জুড়ে,
এমনকি ঈশ্বরও থাকে না মৃত্যুহীনতায়।

কাদের শিখায় তুমি ঝলমল করো,
আমার প্রতি শুধুই অবজ্ঞা রাখো
তোমার গান পূর্ণ শুধুই মিথ্যায়।

তুমি জানোনা কাকে বলে অসুরের দংশন
হৃদয়ের উত্তাপ যা নিয়ে বেঁচে থাকে এই জীবন
আত্মার মুক্তি পেয়ে চলে যাওয়া।
ঈশ্বরেরা আমার বুকে অধিষ্ঠান করে,
আমি থাকি নীরব নির্দেশের পরে ;
আমি জানিনা বিশ্বাসঘাতকতা ;
'তুমি কখনই বন্দী করতে পারো না,
আমাকে, আমার ভালোবাসাকে, অথবা আমার ঘৃণা,
এমন কি আমার আকাঙ্ক্ষার তুই তীর।
বজ্রের মতো তা বিদ্ধ করে
সেই সৌম্যশক্তি যায় হারিয়ে
সুরের রাজ্যে বাঁধে নীড়।'

সংকেত থেমে যায়
তার তীব্র ভ্রূভঙ্গিমায়
আলোর স্তিমিত কম্পন
তারা অনুসরণ করে তাকে
সহসা বন্যার হিংস্রগ্রাসে
মুছে যায় সব দুঃখের অঙ্গন।

একটি ফিলিস্টাইনী বিস্ময়

আমি জানিনা ওরা নিজেদের মধ্যে কিভাবে
ঝগড়া করে, কোন পদ্ধতিতে।
আপনার কোটের বোতামখানা ভালো করে আটকান
মহাশয়, তাহলে পারবে না চুরি করতে।

একটি আত্মিক প্রত্যয়

১

সব কিছু আমরা সেদ্ধ করেছি সংকেতের জলে,
এবং সমস্ত যুক্তি অঙ্কের নিয়মে একেবারে।

ঈশ্বর যদি একটা কিছু হন, চোঙের মতো আকারে যদি না যান,
তুমি তো তোমার মাথার ওপর দাঁড়াতে পারবে না যদি না পারো বলতে—

২

যদি ক সেই প্রিয়তম তবে খ তার প্রেমিকা,
আমি দশ বারের বেশী বাজী ধরতে পারি আমার জামা
তখন ক এবং খ হয় পাশাপাশি
তৈরী করে এক প্রেমিক দম্পতী।

৩

পৃথিবীকে পরপর সরলরেখায় মেপে দেখো একবার
কিছুতেই পারবেনা তার আত্মার বহিষ্কার।
জাতিগত বিবাদ ক এবং খ মিটিয়েই যদি ফেলে
আদালত তবে প্রতারিত হবে নিজের পাওনা থেকে।

জলের ধারে ছোট্ট মানুষটি

একটি ব্যালাড

জল স্ফীত হয়ে ভীতু শব্দ তোলে
তরঙ্গরা ঘুর্ণির মতো ওঠে ফুলে।
মনেই হয়না কোনও যন্ত্রণা তাদের আছে
নীরব মন, নিঃশব্দ হৃদয়,
শুধু জমা হয়, শুধু জমা হয়।

কিন্তু নীচে, গভীরে জল যেখানে ফুঁসছে
এক খর্বদেহী শ্বেতকায় মানুষ বসে আছে।
সে নাচে, যখন চাঁদ ওঠে আকাশের গায়
মেঘের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট তারারা ঝলকায়
নিঃশব্দ ভীতিতে সে
ক্ষীণস্রোতা জলধারা যাতে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে।

৩

তরঙ্গরা তাকে হত্যা করেছে, তারা প্রত্যেকে,
তার প্রাচীন কঙ্কাল তারা খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে,

তারা বরফের মতো তার মাসমজ্জা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ডিত করে
দেখতে চায় কেমন তারা নাচে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে .
তার মুখে থাকে দুঃখের আলপনা, বিষণ্ণতার গম্ভীরে
যতক্ষণ-না পর্যন্ত চাঁদের বুকে সূর্যের আলো এসে পড়ে।

৪

জল তখন স্ফীত হয় ভীতু শব্দ তুলে,
তরঙ্গরা ঘূর্ণির মতো ওঠে ফুলে।
মনেই হয়না কোনও যন্ত্রণা তাদের আছে,
যেভাবে তারা চূর্ণ হয় আবার নেমে আসে,
নীরব মন, নিঃশব্দ হৃদয়,
শুধু জমা হয়, শুধু জমা হয়।

ডাক্তার ছাত্রের প্রতি

নিপাত যাও ফিলিস্টাইনী-ডাক্তারী বিশ্বের নাবিকেরা,
পৃথিবীকে শুধুই রাশি রাশি হাড়ের বস্তা বলে জানো যার
তোমরা হাইড্রোজেন দিয়ে রক্তের শীতলতা আনো যখন
আর যখনই একটু বোঝো নাড়ির স্পন্দন
তখনি ভাবো, "অনেক কিছু করে ফেলেছি।
অনেক, অনেক আরাম মানুষকে দিয়েছি
কি আশ্চর্য চতুর ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় অসীম জ্ঞানবান।"
এবং প্রতিটি ফুলই যথাযথ ব্যবহারময়
যখন গুল্মরস তীব্র দহনে ওষুধে পরিণত হয়।

ডাক্তার ছাত্রের মনস্তত্ত্ব

যে ব্যক্তি নৈশভোজ সারে পিঠে আর চর্বচোষ্যে,
ভুগবেই সে দুঃস্বপ্ন আর স্বপ্নের প্রাচুর্যে।

ডাক্তার ছাত্রের অধিবিদ্যা

আত্মা কোনদিনই ছিল না অস্তিত্বে।
বৃষকুল বেঁচে ছিল, এবং তাদেরও হয়নি হারাতে।
আত্মা এক অলস কল্পনা ;
যকৃতে নিশ্চয়ই নেই তার সন্ধান,
এবং যদি কেউ চায় তাকে কোনো ময়দানে ছোটাতে
একটি বটিকাই তাকে দিতে পারে অসীম মুক্তির, নিষ্কৃত যন্ত্রণা
তখন আত্মাকে দেখা যাবে
অসীম অনন্ত স্রোতে।

ডাক্তার ছাত্রের নৃতত্ত্ববিদ্যা

পরাজয়ে আহত হয় যে মন
অবশ্যই নিম্নাঙ্গে করবে তৈল মর্দন
যাতে কোন ঝড় অথবা বাতাস
সামনে অথবা পেছনে তাকে না করতে পারে হতাশ
মানুষ পৌঁছুতেও পারে তার লক্ষ্যে
সুস্থ পথ্যের নির্দেশে
এবং সংস্কৃতির উন্মেষ হয় তখন
যখন সে ব্যবহারে আনে বিমোচন।

ডাক্তার ছাত্রের নীতিশাস্ত্র

পাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধে হয়, তাই সবথেকে শ্রেয়,
ভ্রমণ সময়ে একটির বেশী ফতুয়া পড়ে থেকো।
সাবধান থেকো সহসা আবেগ সম্পর্কে
যারা ঘটায় পাকস্থলীর অসুবিধে।
দৃষ্টিকে যেখানে সেখানে যেতে দিওনা
আগুনের ফুলকি যে কোন সময় করে দেবে কানা।
মদের সাথে মিশিয়ে জল অবশ্যই
কফিতে দুধ, সবসময়েই,
আর আমাদের ডাক দিতে যেন ভুলোনা
যখন এ জগত ছেড়ে যাওয়ার শুরু হবে দাঁড় টানা।

ওভিদের ত্রিস্তিয়ার প্রথম এলেজি

মুক্ত অনুবাদ

এক

চলে যাও, ওহে ছোট বই চলে যাও সত্বর
চলে যাও সত্য, আনন্দময়তায়।
আমি যাবো না, রয়ে যাব এখানে নিস্পন্দ, স্থির,
সূর্যের আলোকিত উষ্ণতায়।

দুই

যাও দারিদ্র্য-মলিন বেশ!
তোমার প্রভুর শোক-পোষাক ঢেকে দাও
দুঃখতায় আনো শেষ
দীপ্ত ঋজুতায় দুঃসময়ের কাছে নির্দেশ ছুঁড়ে দাও।

তিন

তোমাতে বিস্মিত নয় কোন রক্তিম অবগুণ্ঠন
নীল রঙ রক্তের ছন্দে।
আশা হতাশার নেই কোন সন্ধান
কল্লোলিত নয় আনন্দে।

চার

অশ্লীল নীরবতা তোমাকে ঢেকে থাকে,
নেই কোন চন্দন-সুবাস মিষ্টি,
সুবর্ণ উজ্জ্বলতাকেও লজ্জায় ঢেকে রাখে
তোমার বক্র যষ্টি।

পাঁচ

ভবিষ্যতের আশীর্বাদ নিয়ে থাকে
এই আশ্চর্য উজ্জ্বল বৃত্ত,
শুধু আমার বেদনা তোমার সাথে আছে
আমার দুঃখের নিমিত্ত।

ছয়

রুক্ষ ধূসর হয়ে যেন তুমি আসো
যার চুল ঝড়েতে এলোমেলো,
কিছুমাত্র কোমলতা নেই যেন
কালো পাথরে বুঝি আঁকা ছিল।

সাত

যদি তোমার পাণ্ডুর মুখ হয় বিষাদ মলিন,
তবে তা আত্মারই জন্যে
আর কি অশ্রুতে ভেসে যায় নয়ন
উষ্ণতায় বৃষ্টি হয়ে ঝরে তোমারই অরণ্যে।

আট

ওহে বই, তুমি চলে যাও সেখানে
আমার সেই প্রিয় পবিত্র ভূমিতে।
স্বপ্নেরা আমাকে নিয়ে যায় সেখানে
অলৌকিক শব্দের বাতাসে।

নয়

যদি কেউ, তোমাকে দেখে, অবশেষে
হয়ে যায় স্মৃতিহীন
সুতীব্র কৌতুহলের দেশে
যেখানে তুমি পৌঁছে দাও নিত্যদিন;

দশ

আমি বেঁচে আছি একথা তুমি বলতে পারো
এবং আমি তাড়াতাড়িই মুক্তি চাই
এবং আমার নাড়ী যদি না হয় স্তব্ধ
সে তো অনুদান নয়, অনুকম্পাই।

এগারো

যদি কেউ তোমায়, অন্য কেউ প্রশ্ন করে
প্রতিটি কথাকে বুঝে নাও

সতর্ক হও চিন্তাহীন সংলাপে
শব্দে ও স্বরে নিজেকে ঢেকে দাও।

বারো

অনেকেই ভৎ'সনায় মুখর হয়,
উল্লেখে আনে আমায়
আমায় সঙ্গী বলে পায় ভয়
তোমার চোখ বুজে আসে লজ্জায়।

তেরো

সমালোচনা আর স্বীকারোক্তি শুধু যাও শুনে
কিছু বো'লনা, থাকো নিঃশব্দ।
আগুন পারেনা অগ্নিকাণ্ড থামাতে,
জেনো, দুটি ভুল আনেনা একটিও সত্যলব্ধ।

চোদ্দ

তবুও কেউ কেউ আছে, তুমি দেখবে,
যারা কথা বলে গভীর দীর্ঘশ্বাসে।
অশ্রুতে তাদের চোখ থাকে জুড়ে
দৃষ্টিশিখাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

পনেরো

তখন ভেসে আসবে শান্ত কথায় স্নেহের ভাষা
যে প্রিয় এখন সামান্য চঞ্চল রক্তিম, শোনাবে সে-ও
সীজারের সঙ্গেও হতে পারে বন্ধুত্ব অথবা মীমাংসা
শাস্তির ধার হতে পারে প্রশমিত।

ষোল

সে প্রার্থনা জানায় ব্যাকুল উৎকণ্ঠায়,
'ঈশ্বর অধিষ্ঠিত থাকুন স্বর্গে'
তার জন্য আনন্দে নিমগ্ন থাকি, প্রার্থনায়
'স্পর্শহীন থাকুক সে বিদ্যুতে ও বজ্রে'।

সতেরো

ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে তার কখনও
আহা, সেই আসনে তাহলে আমার মৃত্যু হোক
যেখানে স্থিত থাকে ঈশ্বরও
সীজারের বিদ্যুৎশিখা উত্তাপহীন হোক !

আঠেরো

অতঃপর যখন তুমি পৌঁছে দিয়েছ আমার অভিনন্দন,
আমারই দরজায় তা আঘাত হানতে পারে
নন্দিত হয়নি কোনই বিনম্র মন,
আত্মা হয়েছে ব্যর্থ উল্লাসের উচ্চারণে।

উনিশ

কিন্তু সমালোচকরা হোন সতর্ক
যে সময়ে হয়েছে কাজ
এবং তার বিচার যদি হয় নির্বিতর্ক
তবে ভয়ের কোন কারণ নেই—কেটেছে বিপদ-বাজ।

কুড়ি

কবিতার জাদু প্রবাহিত হয় তীব্র
বুক থেকে উঠে আসে আবেগ,
কিন্তু হায়, নির্মূল করে উৎসাহকে শীঘ্র
আচ্ছন্ন করা দুঃখের কালো মেঘ।

একুশ

তার কবিতা তখন দুঃখ হয়ে ঝরে পড়ে
গায়ক ভীত-বিহ্বল, কর্কশ, নির্বাসিত
এবং ঝঞ্ঝা, এবং সমুদ্র, এবং শীত প্রখর হয়ে
একে একে তাকে করে পরিব্যাপ্ত।

বাইশ

ভয় হবে না বরফের সাথে সংবদ্ধ
যদি উতরোল সঙ্গীত শোনা যায়

এখানে এক নির্জনতা, আমি অশ্রুরুদ্ধ—
চেয়ে দেখ, অদূরেই হত্যার তরবারি ঝলকায়।

তেইশ

এখন পর্যন্ত আমি করেছি যা
সবই বিবর্তিত হয়েছে সমালোচনায়,
এবং সেই ছাড়য়ে দেবে আমার বার্তা
আমার মনের দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়!

চাব্বিশ

আমাকে একজনের জন্য (হোমার) মিওনিদেসকে দাও,
আমারই মত তাকে রাখো দারুণ দুর্বিপাকে,
নষ্ট হয়ে যাবে তার সমস্ত ক্ষমতাও,
বিপদকে সে দেখবে দুচোখ দিয়ে।

পঁচিশ

চলে যাও হে গ্রন্থ আমার, চলে যাও আপন পথে,
লুকিও না দুষ্কৃত-খ্যাতির কণ্ঠস্বর।
যদি কোনও ঘৃণিত ব্যক্তি এসে দাঁড়ায় পথে,
দুঃখ পেয়ো না, লজ্জায় হয়ো না থরোথর।

ছাব্বিশ

তার মানে এই নয় যে ভাগ্যের উত্তাল তরঙ্গ
এত ভালোবাসা দিয়ে বেঁধেছে আমায়
আমার আত্মার যন্ত্রণাকে করেছে তীক্ষ্ণ ও তীব্র
মন তাই নতুন করে গান বাঁধতে চায়।

সাতাশ

যখন আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ নিয়ে আমি শয্যাগত,
উৎসাহ আমাকে সুস্থ করে,
ঔজ্জ্বল্যের সন্ধানে আমি হই তৃষ্ণার্ত,
পৃথিবী মত্ত হয় উৎসবে।

আটাশ

কিন্তু লিরা যদি আগের মতোই বেজে ওঠে,
তার তৃষ্ণা যদি হয় গভীর আগের মতোই
হৃদয় বিদ্ধ হয় না আর কোনও প্রশ্নে,
দেখে কি তবে সঙ্গীত থেকে আমার পতনের দৃশ্যই !

উনত্রিশ

যাও—নিষিদ্ধ তো নয় তা
আমার জন্যে তুমি ঝকমকে রোদ এসো দেখে
পরিবর্তে যদি আমারই হতো যাওয়া
কোন এক ঈশ্বরের তদারকীর প্রশ্রয়ে !

তিরিশ

মনে ক'রো না যে তুমি শুধু ঘুরেই বেড়াবে
তোমার পথ রোমে অননুমোদিত,
মনে ক'রো না যে মানুষের কাছে তুমি নত হবে
তোমার পদক্ষেপ লক্ষ্যহীন, অপরিজ্ঞাত।

একত্রিশ

যদিও তোমার কোনও পদবী নেই, সাক্ষী নেই,
তোমার রঙই করবে নামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।
অন্যথায় তুমি যদি অস্বীকার করো আমাকেই
তবে তুমি নিজেকেই দেখাবে তা।

বত্রিশ

দরোজা দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাও এবং দেখো,
আমার গান তোমাকে করবে না আহত
তারা আর গাইবে না ভালোবাসার উচ্ছ্বাসও
বিষণ্ণ এক হৃদয়কে যা করে আলোকে উদ্ভাসিত।

তেত্রিশ

যে তোমাকে নিয়ে যায় নিষ্ঠুরের মতো
যেহেতু তুমি আমার তিল তিল শ্রমে গড়ে উঠেছো,

এবং ঠেলে দেয় বিপথে যতো
যার গুপ্ত বিপদের কথা তুমি জানোনা কখনো—

চৌত্রিশ

তাকে বলো, "শুধু আমার নাম যেন পড়ে,
তাকে আমি ভালোবাসা শেখাব না আর।
হায়-রে, ঈশ্বরেরা সভায় নেমে আসে
ঊর্ধলোক থেকে পাঠায় কঠিন বিচার।"

পঁয়ত্রিশ

প্রার্থনা করো তা যেন সেই মহান সভায় গ্রথিত হয় না
যা গর্বের ঔদ্ধত্যে পাল্লা দেয় স্বর্গকে
সীজারের মতোও তা হতে পারে না
যেখানে তাব কণ্ঠস্বর ভাসে দীপ্ত গর্জনে।

ছত্রিশ

সেইসব পবিত্র ও শুদ্ধ স্থান
তোমার ঈশ্বর ও প্রভুরা করেছে অস্বীকার।
দুর্গ থেকে বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ,
আমায় নরকে নিয়ে যায় সেই চূড়ান্ত বিচার!

সাঁইত্রিশ

যদিও ঈশ্বর তাদের কাছে বিনম্র দয়ালু এবং মহান
যারা তাঁকে মেনে নিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে,
বসন্তের ছায়া আসে বক্র হাওয়ায়, প্রচণ্ড প্লাবন
আর ঝড়ে, আমরা ভয়ে শংকিত হই যেখানে।

আটত্রিশ

হায় রে, আতঙ্কিত শব্দে ডেকে ওঠে ঘুঘু
যদিও পশ্চিম বায়ু দেয় সাড়া
নিজের শস্যের ওপরে গভীর মমতায় এঁকে দেয় সে চুমু
শিকারী শ্যেনের আঘাতে যে হয়েছে বাক্যহারা।

উনচল্লিশ

ভীতিজর্জর যে মেষ একবার পেয়েছে পরিত্রাণ
নেকড়ের হাত থেকে
যতক্ষণ না পায় সুরক্ষিত কোনও স্থান
থাকবে না সে নিশ্চিন্ত আবেশে।

চল্লিশ

ফীথন যদি বেঁচে থাকতেন আজ,
শুনতে পেতেন না ইথারের গর্জন,
পারতেন না নিতে সেই বাঁধনহারা সাজ
চার ঘোড়ারই রথ টানার মতন।

একচল্লিশ

আমি প্রচণ্ড ভয় করি জোভের অস্ত্র
তার আগুনের সমুদ্র থেকে আমার উত্থান
যখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ে স্বর্গের বজ্র
মনে হয় তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর সতত অনির্বাণ।

বেয়াল্লিশ

কাপহারিয়ান তীরে ঘুরে বেড়ায়
আরগিভ বাহিনীর যে নাবিকের দল,
কেউই আসবে না ফিরে এই বেলায়
এবোয়ার বন্যার মতো প্রচণ্ড প্রবল।

তেতাল্লিশ

পবিত্র শক্তিতে আশ্রিত আমার স্বর,
নিকটকে জানে না, ভাবেই না তা নিয়ে;
গতি এবং নির্দেশ সম্পূর্ণ অন্য পথে তার,
দূরকে নিয়ে উল্লাসে বেজে ওঠে।

চুয়াল্লিশ

সুতরাং, বই আমার, স্থির হও সুস্থ হও,
ভাবো কোন পথে যাবে, হও তাতে যত্নবান।

অতিরিক্ত যশের কোন প্রয়োজনই নেই
যখন সাধারণ মানুষ ধরে দেয় তার কান।

পঁয়তাল্লিশ

অতি উচ্চে ইকারাস গর্জনে মৎ ডরায়,
স্পর্দ্ধিত ভঙ্গিতে ছড়ায় তার পাখা।
তার নাম মৃত্যুরও অতীত হয়ে ভেসে বেড়ায়
সাগরের তরঙ্গে তার গান থাকে আঁকা।

ছেচল্লিশ

হয় শক্ত হাতে টানো দাঁড়,
অথবা ছেড়ে দাও, যেদিকে যায় যাক—
অপেক্ষা করো আরও এক ঘণ্টার—
সময় এবং স্থানই বলবে সব ঠিকঠাক।

সাতচল্লিশ

এবং যখন তার ভ্রু হয়ে আসে টানটান পরিষ্কার,
যখন তার মুখে নেমে আসে দাক্ষিণ্যের শান্ত ছায়া,
যখন তার সমস্ত ক্রোধ মুছে যায় অথবা লালসার,
চলে যায় কুইসেণ্ট, রাখে না কোনও কায়া;

আটচল্লিশ

যখন তুমিও থাকো সেই বিরামহীন সন্ত্রাসে
পরোয়া করো না আতঙ্কের আহ্বান,
তারপর সস্নেহ বন্ধুত্ব ও শব্দের আবেশে,
রাত্রির পরে আসে যে দিন, তুমি নাও তার আঘ্রাণ।

উনপঞ্চাশ

ভাগ্যের ঘণ্টা বাজে আরও হালকা শব্দে
তোমার প্রভুর মতন না হয়ে তুমি তাতে আনন্দিত হ
তোমার ক্ষতের যন্ত্রণা মলিন হয়ে আসে,
মার্জনা কথা বলে গাঢ়তম নম্রতায়।

পঞ্চাশ

আঘাতে কমানো যায়, কমাতে পারে সে-ই
যে তার এই ক্রোধের মূল কারণ।
তেলেফুসকে আহত করেছিল অ্যাকিলিসই ;
এবং আঘাতকে সে-ই করেছে উপশম।

একান্ন

অবশ্যই জেনো, ছড়াবে না বিষ অথবা গরল
যদি চাও সুস্থির সঠিক ঘটনা।
আশা করো বাতাসী স্বপ্ন উজ্জ্বল
নতুবা সন্ত্রাস আনবে রাত্রির যন্ত্রণা।

বাহান্ন

সতর্ক হও, পাছে এই শান্ত আস্তরণ থেকে
সহসা উত্থিত হয় ঝড়ের রুদ্ররূপ,
আমার ওপর শত সহস্র শত্রু আসে নেমে
তোমার অবিশ্বাসের ফুল থেকে নিঃশব্দ নিশ্চুপ।

তিপ্পান্ন

কিন্তু কাব্য ও সংগীতদেবীদের প্রাসাদে
যদি থাকে আন্তরিক আমন্ত্রণ,
তুমিও উজ্জ্বল হতে পারো সেই আলোকে
যেখানে আছে সাহিত্য ও যশের মিলন।

চুয়ান্ন

সেখানে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে
সারিবদ্ধ সহোদর, যাদের
আমি এনেছি একান্ত মোহাবেশে
দিন নিভে এলে পর।

পঞ্চান্ন

অন্যের নাম উচ্চারিত হয় খোলা উল্লাসে
জয়ের দৃপ্ত স্পর্ধায় :

আশার মতো ভ্রু-এর ওপরে তা জ্বলে,
কবিতার উচ্ছ্বলতায়।

ছাপ্পান্ন

প্রতিটি অংশ থেকে তিনজনের সম্মিলন,
অন্ধকারের চাপ প্রতিটি দিকে।
ভালোবাসার শিল্পের সঙ্গে তাদের গুঞ্জন,
উল্লাসের বুদ্বুদ ফোটে প্রত্যেকের বুকে।

সাতান্ন

হয় উড়িয়ে দাও, নয়ত সাহস করে ডাকো
অভিশাপ ও অন্ধকারের আতঙ্কের প্রশ্নে
ঈডিপাসের পতনের কথা মনে রেখো,
তেলেগনুর ভয়াবহ অপরাধে।

আটান্ন

সঙ্গীত দিয়েছে মুক্তি
আগুন ও শিখায় মৃত্যুর হাত থেকে
তুমি বলো এই বিবর্তনের কাহিনী
এবং সেই পৃথিবীর, যা আছে আত্মিক শক্তিতে ঢেকে।

ঊনষাট

এখন বরং তুমি গল্প বলো পরিবর্তনের
শেষপর্যন্ত যা আমার ভাগ্যকে করে দেবে পার,
কেমন করে তা বদলে যায় অসম্ভবে,
আর কেমন ভাবেই বা আঙ্গিক বদলায় তার।

ষাট

একসময়ে ছিল ভিন্ন, যখন আমি নিয়েছি টেনে
সাফল্যের রক্তিম ঠোঁট থেকে উষ্ণতা।
যেখানে অমরতা থাকে গভীর বন্ধনে,
অশ্রু ঝরায় সুতীব্র বেদনা।

একষট্টি

তাহলে কি আমি চাই, তোমার প্রশ্নের এই
উত্তর আছে লেখা তোমারই মুখের ওপর।
তারই মাঝে গতি আনে প্রদীপ্ত হোরি
ঊর্ধ্বমুখে চলে যায় তরঙ্গের স্বর।

বাষট্টি

এবং তোমার সাথে যদি আমাকে হয় পাঠাতে
সমস্ত অন্তর, অন্তরের সমস্ত কিছু,
ওহ্, কিছুতেই লক্ষ্যে পারিনা পৌঁছতে ;
এই বিরাট ভার বাহককে করে নতজানু।

তেষট্টি

পথ বহুদূর। নষ্ট করার মত সময় নেই,
হে বই আমার! পৃথিবীর শেষতম প্রান্তে
কৃষকদের সঙ্গে আমি সেখানে দাঁড়াই;
সমস্তে বঞ্চিত থেকে তারা আজ যেখানে।

য়েনীকে শেষ সনেট

তোমাকে আর একটি কথা আমি বলতে চাই, সন্তান আমার
উজ্জ্বল এই কবিতার আলোয়, আমার গানের শেষে
যেন রুপোলি আলোর ঝর্ণাধারায় তা ভেসে যায়
প্রিয়তমা য়েনীর নিঃশ্বাসে সেই সুর এসে মেশে।

যেন অনেক সাগর, অনেক অরণ্য ও জলপ্রপাত পেরিয়ে
অস্পষ্ট ছায়ার মতো কাছে এসে দাঁড়ায়
জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তও যেন থমকে থাকে
যতক্ষণ তা তোমার মাঝে পূর্ণতার ছোঁয়া পায়।

আগুনের হল্কায় সেজে আছে তার সজ্জা
আলোর সঞ্চারে হৃদয় হয় উত্থিত

সমস্ত বন্ধনকে করি ছিন্ন, হই বিজয়বত্তা
মুক্ত আঙিনায় যাই আমি হেঁটে দৃপ্ত পদক্ষেপে
তোমার উজ্জ্বল মুখ ঘিরে বেদনা চূর্ণিত
যখন স্বপ্নেরা করে ঝিকমিক জীবনের বৃক্ষে।

পাগলী

একটি ব্যালাড

জ্যোৎস্নায় সেই রমণী নাচে
ক্ষীণ আলোকে ঝলকায় গভীর রাত্রিতে
পরিচ্ছদ ওড়ে বন্য হাওয়ায়, চোখ জ্বলে ঝিকমিক
পাথরের গায়ে বসানো যেন হীরের মতো চিকচিক।

কাছে এসো, কাছে হে সমুদ্র আমার!
আমি নম্র চুম্বন রাখবো দেহে তোমার
পরাও আমায় বৃক্ষের মতো মুকুট
জড়াও আমায় সেই পোষাকে নীল আর সবুজ।

আমি এনেছি সোনা আর পদ্মরাগ মণি
যখন আমার হৃদয়ের রক্তে ওঠে বেদনার ধ্বনি
উত্তপ্ত বক্ষে সে যে ভালোবাসার আলিঙ্গন
শান্ত গভীর সাগরে তার উন্মীলন।

"শুধু তোমারই জন্যে আমি গাইব আমার গান
বাতাসের তরঙ্গে ডাকবে জোয়ারের বান
আমি ভাসব নৃত্যের সপ্তমে
বাতাস তরঙ্গ হবে শিহরিত থরোথরো কম্পনে।

হাতে তার জড়ানো বিশাল তমাল
বাঁধা আছে তাতে নীল সবুজের পাল
দৃষ্টি তার দুরন্ত স্পর্দ্ধায়
নিঃশব্দে হালকা তালে এগিয়ে যায়।

তোমার ডানা দুটো আমাকে দাও
সমুদ্রকে চাই নিক্ষেপ করতে প্রত্যুত্তরে
মা আমার, তুমি তো জানো
আমি তোমারই সন্তান জন্মের অধিকারে !

এত নৈশ-নিঃশব্দে সে এখানে ওখানে যায়
সমুদ্র তাকে প্রতিটি আঙ্গিকে সাজায়
নৃত্য মুখরা হয় সে ওঠা-নামার তালে তালে
যতক্ষণ না এই জাদু শেষ হয়, সে নেচে চলে।

য়েনীকে দুটি গান
চেয়েছিলাম
প্রথম গান

আমি জাগলাম, সমস্ত অভিঘাত টুকরো করে
"কোথায় যাবে তুমি ?" "সেই পৃথিবী যেখানে খুঁজে পাই নিজেকে !"
"সেখানে কি বিছিয়ে আছে সবুজ তৃণের উজ্জ্বল নরম গালিচা,
নীচে অনন্ত সমুদ্র আর ওপরে রাশি রাশি তারা ?"

"জেনে রাখো মূর্খ, তা অতিক্রমের কোন ইচ্ছেই আমার নেই
সংঘাত সেখানে পর্বতে, শব্দ ওঠে ইথারেই।
তীব্র বেদনায় যেন বেঁধে আসে দুটি পা,
প্রেমের স্পর্শাতুর সম্ভাষণ চুপিচুপি গাঁথে মালা।

পৃথিবীকে আমার থেকেই উত্থিত হতে হবে
আমারই বুকের সঙ্গে নম্রতায় মিশে থাকবে
আমারই রক্ত থেকে তার বসন্তের উৎসব
আমারই নিঃশ্বাসে থাকে তার নৃত্যের রৌরব।"

যতদূর পারি ততদূরেই যাই
ফিরে আসি, ওপরে নীচে পৃথিবীকে ধরে রাখতে চাই।
তারই মাঝে চমকায় উজ্জ্বল সূর্য, ঝিকমিক নক্ষত্র
সহসা আলোর বিদ্যুৎ, তারপরই অন্ধকার নৈঃশব্দ।

পেয়েছি

দ্বিতীয় গান

লতারা কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে
মালা কেন ভাসে বাতাসের উচ্ছ্বাসে,
কেন আকাশ এত নিঃসীম অনন্ত দূর,
মন যেতে চায় মেঘাচ্ছন্ন চূড়ায় সুদূর ?

যদি আমার ডানায় আমি সেখানে যাই উড়ে
বাতাস ভেদ করে পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনি আসে ফিরে
দৃষ্টি আর নক্ষত্রালোকের কি কখনও মিলন হয় ?
তবুও আমি তাকাই, উজ্জ্বলতা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়

পার হয়ে যাও জীবনের সমস্ত তরঙ্গ,
যে-কটি সেতু আছে, করো চূর্ণ,
উদ্দীপ্ত হও স্বর্ণোজ্জ্বল স্বাধীনতায়
যখন অধিষ্ঠান প্রাণহীন শূন্যতায়।

আবারও প্রবাহিত হয় মুক্তধারায়
কাঁপে, ঝলকায় বিস্মৃতির শান্ত ছায়ায়
কোথায় সে চেয়েছিল পৃথিবীকে ?
তোমাতে, তোমাতে, পৃথিবীরই গভীর গোপনে।

ফুলের রাজা

একটি ফ্যানটাস্টিক ব্যালাড

"সূর্যের উজ্জ্বল সোনালী আলোয়, ছোট্ট মুনিয়া,
তুমি বুঝি হতে চাও ফুলের দেশের রাজা ?
ছুটে যাও চঞ্চল, উচ্ছল, উদ্যমে,
রেখে যাও রক্তের ছাপ আমাদেরই মনের রঙে।"

২

"ঝকমকে তাজা ফুল অথবা নিষ্প্রভ,
আমার রক্তকে তুমি শুষেছ, নিয়েছ গভীরে।
এখন আমার রাজপ্রাসাদে বাজে নৈঃশব্দ।
আমাকে শুধু থাকতে দাও ফুলের বৃতির অন্তরে।"

৩

"তোমার রক্ত, ওহে মানুষ, কি মিষ্টি ছিলো,
তোমার হৃদয়কে একবার খুলে দেখাও, যদি পারো।
যদি তুমি রাজা হও আমাদের
তোমার হৃদয় হবে উজ্জ্বল যেন সূর্যের।"

৪

"দূরে, বহুদূরে সত্যের মতো হৃদয় আমার,
হয় উত্তাল, জ্বলে স্থিরদৃষ্টিতে।
যদি আমি সেই হৃদয় দিয়ে দিই তোমায়,
তবে আর তো পারব না সেইভাবে তাকাতে।"

৫

"ছোট্ট মুনিয়া, আশ্রয় চাই আমরা সকলে
তোমার বুকের গহন গভীরে।
তোমার হৃদয় যখন সূর্যের রঙে রাঙা
তখনই তুমি হবে আমার ফুলের বাগানের রাজা।"

৬

সে ভাবে, সে দেখে, অশ্রুমতী হয়
রক্তগোলাপ বুকের ছায়ায়।
"আমার চাই রাজদণ্ড, অন্য কিছু নয়,
এবং উষ্ণীষ, বিনিময়ে হৃদয় দেওয়া যায়।"

৭

"তোমার বোধ হয় আর হলো না,
ফুলেদের রাজা হওয়া, মিথ্যেই হলো জল্পনা।

রক্ত গোলাপ বুক এখন নিঃস্পন্দ
তোমার হৃদয় প্রোজ্জ্বল ছিল আমাদেরই জন্য।"

৮

সে তার চোখ উপড়ে ফেলে নিজেরই হাতে
গভীর গহ্বরে নিজেকে করে স্থিত
নিজের কবর নিজেই রচনা করে
সময়ের পরে সে থাকে শান্ত সমাহিত।

সামুদ্রিক পাহাড়

পাথরের স্তম্ভ সুউচ্চ শিখর
ধারালো চূড়া দেখে বাতাস
পচন, জীবনের সমাপ্তি
অতল জলরাশিতে ক্ষয়ের আভাস।

মাথা তুলে দাঁড়ানো বীভৎস খাড়াই
জমি আঁকড়ে থাকে লোহার বাঁধাই।
তাকে ঘিরে প্রসারিত হয় উজ্জ্বল রক্তিমাভা
উদ্‌গত হয় উন্মত্ত ও উষ্ণ মস্তিষ্ক থেকে,
সাগরে আনে জোয়ারের তেজ
উন্মাদ উদ্দাম, বারবার থেকে-থেকে।

ছেঁড়া-ছেঁড়া জমাট শ্যাওলা অস্থির হয়ে ওঠে
পাহাড়ের খাঁজ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে।
আসে মধ্যরাত, ওঠে উন্মত্ত গর্জন
পাথরের গর্ভ থেকে,
যেন ঘুম ভেঙে উঠল হাজার বছরের জীবন
স্মৃতি মেললো পাখা সহস্র চীৎকারে।

সমুদ্রযাত্রীরা আড়ি পেতে শুনতে যায়।
অমনি পাথরে সঙ্ঘাত, সমুদ্রে হারায়।

নিদ্রোত্থান

১

তোমার ঘুমন্ত দুটি চোখ যখন প্রস্ফুটিত হয়
আহ্লাদে মিটিমিটি কাঁপে,
যেমন সেতারে ওঠে তারের কম্পন
কখনও চুপচাপ, নিদ্রা চায়
লিরার মতন,
সুন্দরতম রাত্রির আবরণ সরিয়ে
আকাশ থেকে ঝরে পড়ো,
চিরন্তন তুমি নক্ষত্রমালা
নিঃশব্দে শুধু ভালোবাসো।

২

মিটিমিটি তুমি কাঁপো, তারপর ডুবে যাও
বুকেতে বেদনা জমাট
তুমি দেখো শাশ্বত এই পৃথিবী
সীমাহীন দৃশ্যপট
আকাশে আছ তুমি, আছ নীচে,
অশেষ অসীম, স্পর্শের বাইরে,
ভাসো তুমি নৃত্যের ছন্দে
গতিহীন যাত্রায়;
এক অণুকণা, পরিব্যাপ্ত সৌরসীমায়।

৩

তোমার নিদ্রোত্থান
এক অনন্ত সময় ধরে জেগে ওঠা,
তোমার জেগে ওঠা
এক অনন্ত সময়ের বিদায়-গান।

৪

যখন তোমার হৃদয়ের উজ্জ্বল
শিখা ঠিকরে পড়ে নিজস্ব গভীরতায়,

বুকের ভেতরে বাজে,
ফুলে ফুলে ওঠে সীমাহীনতায়,
হৃদয়ের টানে
জাদুকরী সুরের গানে
আত্মার ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসে
আত্মার গোপন হৃদয়।

৫

তোমার ডুবে যাওয়া
এক অনন্ত উদয়,
তোমার অনন্তবার ফিরে আসা
কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে—
ইথারে ছড়ায় রক্তিম শিখা
স্রষ্টার চিরন্তন চুম্বনে।

নৈশ ভাবনা

একটি স্তবর্গাথা

ওপরে চেয়ে দেখো, হালকা চালে মেঘ ভেসে যায়,
  তার খাঁজে খাঁজে ঈগলেরা পাখা ঝাপটায়।
ঝড়ের মতো জড়ো হয়, বৃষ্টির মতো ঝরে অগ্নিকণা,
  সকালের দিগন্ত থেকে ফুটে ওঠে আজকের নৈশভাবনা।
ভাবনা ওড়ে, একান্তই স্বতঃস্ফূর্ততায়,
  ইথারের তরঙ্গে উন্মত্ত অভিশাপ।
চোখ ফেটে রক্ত ঝরে, আতঙ্ক অবিরাম
  সমুদ্র তরঙ্গ ছোঁয় আকাশের ছাদ।
নিঃশব্দ ইথার, নিস্তরঙ্গ-নিরুদ্বেগ
  মেখলার মতো জড়ায় অগ্নিশিখায়
বাহুতে সংঘর্ষ। জঠর তার আচ্ছন্ন তমসায়
  পৃথিবীর দুঃখে আনত যত মেঘ।

হতাশগ্রস্ত জনৈককে আহ্বান

তাই এক ঈশ্বর লুণ্ঠন করেছে আমার সব কিছু
  অভিশাপে, ছিন্নভিন্ন করেছে ভাবনা।

গোটা পৃথিবী বিস্মৃতির পিছু পিছু !
আমার ভেতরে শুধু প্রতিশোধের কামনা।
নিজের ওপর প্রতিশোধ নেব গর্বিত ভঙ্গিতে,
তার ওপর, যে প্রভুকে সিংহাসনে চড়ায়,
আমার দুর্বলতাকে যে ভরিয়ে দেয় শক্তিতে,
আমার ভালোর জন্য, কোনো নজরানা ছাড়াই।
আমি আমার সিংহাসন বসাবো উঁচুতে,
যার শিখর হিমশীতলে আবৃত
কুসংস্কারের ভয় দিয়ে যার প্রাচীর বেষ্টিত
সেনাপতি হবে ঘৃণ্যতম ক্রোধ।
একবার যে তাকায় তার দিকে সুস্থ চোখে,
সহসা আঘাত, মৃত্যুর মতো বিবর্ণ-বধির,
দৃষ্টিহীনতায় আচ্ছন্ন, নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসে
সুখ রচনা করে তার সমাধির।
সর্বশক্তিমানের বজ্র ঠিকবে ফিরে আসে
সেই লৌহকঠিন দানবের কাছ থেকে।
সে যদি আমার প্রাচীর ও চূড়া ধ্বংস করে,
চিরন্তনই তাদের উর্ধে তুলে ধরে।

তিনটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু

তিনটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু শান্তভাবে জ্বলে,
নক্ষত্রের মতো চোখ নিয়ে ঝলকায়।
ঝড় মত্ত হতে পারে, চীৎকৃত বাতাস,
তিনটি আলোকবিন্দু থাকে নিষ্কম্প, স্থির ভাষায়।
অন্যেরা তাকিয়ে দেখে পৃথ্বীর ইমারত,
শোনে প্রতিধ্বনিত বিজয়ের আহ্বান,
ফিরে যায় নীলিমায়, ধরে ভগিনীদের হাত,
মুগ্ধ হয় মূর্তির প্রশান্ত অস্তিত্বে, মদির প্লাবন।
শেষতমটি জ্বলে সোনালী আগুনে,
শিখা উতরোল, গ্রাস করে ব্যাপ্ত দুনিয়া,
তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় হৃদয়ে, আর দেখো চেয়ে—

উল্লসিত হয় ফুলে ফুলে ঢাকা গাছের সৌরভে।
তিনটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু শান্তভাবে জ্বলে তখন
পাশাপাশি নক্ষত্রের চোখ নিয়ে ঝলকায়।
ঝড় মত্ত হতে পারে, বাতাস এলোমেলো যখন।
দুটি হৃদয় ভাসে প্রশান্তির হাওয়ায়।

চাঁদের মানুষ

নক্ষত্রচ্ছটা সারা গায়ে মেখে, জড়িয়ে নিঃশ্বাস;
লাফিয়ে লাফিয়ে যে ওঠে আর নামে,
নৃত্যের ভঙ্গিমায় চলে চাঁদের মানুষ,
কাঁপে তার দেহ, অঙ্গের সৌষ্ঠবে।
স্বর্গের প্রভা ঝরে হালকা অশ্রু শিশিরের মতো,
বেয়ে পড়ে তার কেশ-তরঙ্গে,
গা থেকে নামে মৃত্তিকায়
যতক্ষণ না মুকুলিত হয় ফুলের সৌরভে।
ফুলকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তারপর, পল্লবিত হয় বাতাসে
স্তরে স্তরে টুকরো টুকরো সোনায়।
ফুলেরা গল্প শোনায় পৃথ্বীর প্রাসাদে
চাঁদের মানুষের কাহিনী জানায়।
এমনই বন্ধুর মতো সে হাসে
যদিও বেদনায় টানটান।
পড়ন্ত রশ্মির সঙ্গে থাকে,
সূর্যের হৃদয়ে তার আঘ্রাণ।
সে থাকে দীর্ঘ-অপেক্ষায়, শোনে দীর্ঘক্ষণ
ঘুম ভাঙা জগতের শব্দ।
সে চায় সঙ্গীত হয়ে যেতে
নেচে যাওয়া ফুলের ওপরে ঝরে পড়তে।
তার বেদনায় নতজানু হয় পৃথিবীর বীথিকা
যতক্ষণ বেজে ওঠে প্রান্তর;
তার মিষ্টি জোছনায় নিজেকে জড়িয়ে সে
ঝাপটায় তার ডানা, অবশেষে নিথর।

লুসিণ্ডা

একটি ব্যালাড

জীবন নন্দিত হয় আনন্দ ও উল্লাসে
যেমন নর্তকীর পায়ে ওঠে ছন্দের ঢেউ।
প্রত্যেকেই গৃহীত হয় বিশেষ অনুভবে
তৃপ্তির পবিত্র মাত্রাতেই।
গোলাপী চিবুক মাথা তুলে দাঁড়ায়
হৃদয়ের রক্তের চেয়েও দ্রুতগতি,
আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘায়ত সীমানা
তোলে স্বর্গীয়লোকে আত্মার অবস্থিতি।
বন্ধুত্বের চুম্বন এবং হৃদয়ের ঐক্য
গাঁথে সবাইকে এক বৃত্তে,
দূর করে মর্যাদার সংঘাত, মতের অনৈক্য,
ভালোবাসা থাকে নেতৃত্বে।
কিন্তু অলস স্বপ্ন এ-যে
যা জড়ায় উষ্ণ হৃদয়, এবং উড়ে যায়
ধূলোভরা এই পৃথ্বীর দৃশ্য থেকে
ইথারভরা দূর আকাশের গায়।
দেবতারা দেখতে চায়না নির্বুদ্ধিতা
মানুষের, নিজেদের মূর্খতার অন্ধত্ব,
যে মানুষ ভাবে স্বর্গসুখের কল্পনা
স্বর্গকে সে করাবে মৃত্তিকা-গন্ধময় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
দিগন্তে আবির্ভূত হয় বিষণ্ণ মুখ
ছিন্ন করে তরবারি ও ছুরিকায়,
হিংসার আগুন গ্রাস করে তার বুক,
ঘৃণা করে তার ঘৃণিত হৃদয়।
আর সেই নারী, কণ্ঠে যার পরিণয়ের মালা,
একদা ছিল সেই পুরুষের কাছে জীবন ও ভালোবাসা
একদা সেই নারী দিয়েছিল প্রতিশ্রুতির ডালা
এবং তারা হৃদয়, অতুল ঐশ্বর্যে সেই পুরুষের পাশে আসা।

মঙ্গলের জন্য তাই যুদ্ধে,
নারীকে বিশ্বাস করে, সে চলে যায়,
দেবতারা পুরস্কৃত করে তার এই সন্ধানকে,
দিন উল্লসিত হয় তার জয়গাথায়।
জয়ের মালা পড়ে সে ফিরে আসে
তার শান্ত পুরনো বাসভূমিতে,
তার প্রিয়তম রত্ন যেখানে জলে,
আকাঙ্ক্ষা ডেকে আনে নিদারুণ মূর্খতাকে।
তখন সে দেখে লড়াই,
তার হৃদয় চৌচির বিক্ষোভে
যা সে চায় জয় হবে শীঘ্রই,
স্বপ্ন পরিণত হবে বাস্তবে।
সে পা বাড়ায় দরোজার দিকে
যে-বাড়িকে সে ভালোবেসেছে এত।
সে-বাড়ি আজ সজ্জিত আলোকে
অতিথিদের আনাগোনায় চমকিত।
দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিল যে-প্রহরী
সহসাই হাত বাড়িয়ে তাকে থামায়।
"আগন্তুক, ছাদে যাবে কি তুমি
যেখানে মানুষেরা আজ ভীড় জমায়?"
"ওহে, আমি সুন্দরী লুসিণ্ডাকে চাই!"
খোলা-চোখ প্রহরী উত্তর দেয় থেমে-থেমে।
"তাকে তো এখানে পেতে পারে সবাই
কারণ লুসিণ্ডাই তো আজকের কনে।"
বিস্ময়ে বিমূঢ়, আগন্তুক সোজা হয়ে দাঁড়ায়
তার চূড়ান্ত দৈহিক দৈর্ঘে,
বুক টানটান, চোখের রক্তিমাভায়
পা ফেলে সে দরোজার চৌকাঠে।
"তোমার উৎসবকে তুমি উপভোগ করো
এই জমজমাট জায়গায় চমৎকার,
অবশ্যই তুমি অতিথি হবে বলে যদি ভাবো!"

চীৎকৃত হয় প্রহরীর কণ্ঠস্বর।
গর্ব এবং বিষণ্ণতা, দ্বিধা নিয়ে সে ফিরে আসে,
পার হয় দীর্ঘ পরিচিত পথ।
হৃদয়ে আগুন, দুঃখের অবসন্নে
চোখে ঝলসায় দুরন্ত ঝড়।
গৃহের সেই অভ্যন্তরে
ঝোড়ো বাতাসের মতো ঢুকলো সে,
দরোজা চুরমার, সশব্দে আছড়ে পড়ে
তার ধাক্কায় এবং তীব্র পদাঘাতে।
পরিচারিকার হাত থেকে কেড়ে নেয় মোম
স্থির রাখে হাত, পাছে দৃশ্য কাঁপে;
কপাল জুড়ে ভ্রু-র ওপর ঠাণ্ডা ঘাম
নিঃশব্দ শোকে বিন্দু বিন্দু জমে ওঠে।
তার ঘাড় থেকে ঝুলে পড়ে
বেগ্‌নে রঙের জামা, আশ্চর্য সুন্দর,
নিজেকে সাজায় সে সোনার অলঙ্কারে,
ঘাড় থেকে নামে কেশগুচ্ছ।
সে তার বক্ষের মাঝে
সজোরে চেপে ধরে স্বর্ণখচিত তরবারি
যা গর্বের সঙ্গে ব্যবহার করত সে
ভালোবাসতোও ঠিক ততখানি।
বাতাসের পাখায় সে উড়ে যায়
অনুপম স্ফূর্তির প্রাসাদে,
মাথা উঁচু করে থাকে হৃদয়
মৃত্যুর ঝিলিক তার চোখে।
কাঁপতে কাঁপতে দরজা দিয়ে সে ঢোকে
ভেতরের বিশাল সামিয়ানা ঘরে।
ভাগ্যদেবতারা তার নাম ধরে ডাকে,
অভিশাপ উচ্চারিত ফিসফিস করে।
সে কাছাকাছি হয়, বেদনায় নতজানু
কিছুটা গর্বিত তার পোষাকে,

অতিথিরা সব সন্ত্রস্ত, কাঁচুমাচু
তার ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে।
ভূতের মতো সে লম্বা পা ফেলে
যায় একা-একা, জমজমাট সেই ঘরে।
যতক্ষণ না অতিথিরা ধীরে ধীরে পিছু হটে,
উৎসব পরিণত হয় ভণ্ডুলে।
ভীড় করে থাকে সব নর্তকীরা,
কিন্তু অপরূপা তাদের মধ্যে লুসিণ্ডাই।
ফেনিল স্বচ্ছ পোষাকের ওড়না
ভেদ করে দেখা দেয় তার বক্ষই।
প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে আছে নিথর, নিঃশব্দ,
ব্যাপ্ত সম্মোহনে মুগ্ধ সবাই,
প্রসারিত দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে হয় নিবদ্ধ
সবার চোখে শুধু লুসিণ্ডাই।
আর তার চোখ পরিপূর্ণ উৎকল্পনায়,
হাসিতে তার উজ্জ্বল বিদ্যুৎচ্ছটা;
দেহের চমক নিয়ে সে এগিয়ে যায়,
বহুরঙা নৃত্যের ঝাপটা।
সামান্য হিল্লোলে সে সেই পুরুষের পাশে দাঁড়ায়,
কিন্তু সে তো শব্দ রাখে না উত্তরে;
মেঘ জমে ওঠে লুসিণ্ডার ছায়ায়
তার গোলাপী চিবুকে আঁধার নামে।
সে মিশে যায় ঘিরে থাকা অতিথিদের মধ্যে,
আগন্তুকের কাছ থেকে ঠিকরে সরে যায়,
কিন্তু তখনই শোনে সে ফিসফিস শব্দে
কোনো এক ঈশ্বর যেন তাকে দোলায়।
ধূসর চোখে সেই পুরুষ তাকে দেখে,
অমঙ্গল দৃষ্টিতে নিষ্পলক।
নর্তকীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখে চোখে প্রশ্নের ঝলক।

কিন্তু লুসিণ্ডার কণ্ঠস্বর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে,
মনে হয় রুদ্ধ করেছে যেন তা কে।
প্রাণপণে সে শ্বাস টানে, ছাড়ে
আঁকড়ে ধরে তার পরিচারিকাকে।
"হায়-রে! তোমাকে আজ দেখি আমি বিশ্বাসহীনা,
যে একদিন সঁপেছিল নিজেকে আমার কাছে,
তুমি, লুসিণ্ডা, তুমি এক বিশ্বাসঘাতিনী
আজ তোমায় দেখি অন্যের বধূর বেশে।"
জনতা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়
তার এই উদ্দাম আচরণে,
কিন্তু সবাইকে সে সরায় হুঙ্কারের ঝাপটায়,
বজ্রের মতো ধ্বনি তোলে সে।
"মাথা গলাতে এসোনা কেউ!"
তার চোখে হিংস্রতার স্পষ্ট ছায়া,
উপস্থিত যারা, তারা শোনে প্রত্যেকেই,
শোনে বেদনায় ঢাকা তার কথা।
"ভয় পেওনা, আমি তার কোনও ক্ষতি করব না,
আজ রাতে তার নেই কোন আশঙ্কাই।
তাকে দেখতে হবে শুধু সেই ঘটনা
যা আমি মঞ্চস্থ করব শুধু মাত্র তার জন্যই।
"নাচ করো না বন্ধ
চলুক স্ফূর্তির হিল্লোল।
অচিরেই প্রেমিকের আলিঙ্গনে তুমি আবদ্ধ,
আমার কাছ থেকে পাবে মুক্তির কল্লোল।
আমিই হবো বৈবাহিক-সংযোগ
অভিনন্দিত করব এই ঘটনা।
কিন্তু ভেবে রেখেছি অন্য পথও—
রাত্রি এবং তরবারি হবে আমার কামনা।
তোমার চোখ থেকে আমাকে শুষে নিতে দাও
অপরিমেয় আবেগ, অনন্ত দীপ্তি।

আহ্, আমি তো দেখেছি তোমার দৃষ্টি,
দেখো আমার জীবনের রক্তের স্রোতও !"
তার হাতেই ছিল তরবারি
সহসা তা সে বিদ্ধ করে,
জীবনের তন্ত্রীগুলি যায় ছিঁড়ে,
তার চোখে অন্ধকার খেলা করে।
শব্দ তুলে সে পড়ে যায়
লুটিয়ে পড়ে পেশী অবশ আলস্যে।
তার দেহে নামে মৃত্যু পায়ে-পায়
কোনো ঈশ্বরই জাগায় না তাকে।
ক্ষিপ্র গতিতে লুসিণ্ডা টেনে নেয় ছুরি ও তরবারি
বিনা কথায় কম্পন তোলে তায়।
লোহার ফলক তার দেহে বসে যায়,
ফিনকি দিয়ে রক্তে মাখামাখি।
মুহূর্তমধ্যে রক্তের ধারায় সিক্ত,
সতর্ক পরিচারিকা,
তার দেহ থেকে টেনে নেয় মৃত্যুর ফলক,
তুলে নেয় বিষাক্ত ছুরিকা।
লুসিণ্ডা আচ্ছন্ন হয় তীব্র নীল বেদনায়
লুটিয়ে পড়ে সে আগন্তুকের দেহের ওপর।
তার হৃদয় থেকে সে রক্ত টেনে নেয়
তার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় রক্ত নিজের।
সুশুভ্র পোষাক তার
যা তাকে আবৃত রেখেছিল,
এখন লোহিত বর্ণ, তাজা রক্তের ছাঁটে
সর্বত্র ছোপছোপ বুদ্বুদ এঁকে দিল।
তাকে জড়িয়ে ধরে সে ফুলে ফুলে ওঠে কান্নায়
যে এখন মৃত্যুতে লীন।
সে বেঁচে উঠতে পারে এই ভরসায়
যদি মৃত্তিকায়ও আসে প্রাণ, একদিন।

রক্তস্নাত হয়ে সে ওঠে
তার থেকে, যাকে সে বেসেছিল ভালো।
এগিয়ে যায় স্তব্ধ জনতার দিকে
গুঞ্জন ওঠে তাদের মাঝে, আতঙ্কে থরোথরো।
এবং এক দেবী, দীর্ঘকায়, কাছে আসে,
তার নিজেরই পতনের স্রষ্টা,
দৃষ্টি সরায় তার ওপর ধ্বংসের ঝলকানিতে,
যার কাছে বিবাহে সে আবদ্ধা।
একটু হাসি, বরফ-শীতল, সামান্য বিদ্রূপ,
খেলা করে তার বিবর্ণ ঠোঁটে।
ভেঙে পড়ে সে অনুশোচনায়, রুদ্ধ বিলাপ
উন্মাদিনীর ছায়া ধরে।
ভেঙে গেল সব উৎসব, সব কোলাহল,
বিদায় নেয় নর্তকীরা, একে একে উধাও সবাই,
শুধু ভয়ঙ্করের মতো বাজে নৈঃশব্দ্য
ভেঙে যাওয়া সামিয়ানা-ঘরের শূন্যতায়।

সংলাপ

এক গায়ক দাঁড়িয়েছিল উৎসব সমাবেশে,
বুকের উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরেছিল তার বীণা,
তারে সুর তোলে পরম আহ্লাদে।
"কেমন করে তুমি ঝঙ্কার তোলো, গানের ধুয়া,
কেমন করে বাজো, হৃদয়ে যা আনে বেদনা
তোমার আগুনের স্পর্শে?"
গায়ক, তুমি কি ভাবো আমি অনুভূতিহীন, ঠাণ্ডা
বুকের আলোয়, আত্মার গুঞ্জনে
উঠে আসা ঝলমল প্রতিবিম্বে?
তারা ঝলকায় যেমন দীপ্ত নক্ষত্র-মৃত্তিকা,
তারা জাগে, গর্জন করে লেলিহান শিখার মতো
তারা নিয়ে যায় বৈভবময় জীবনের প্রান্তে।
"আমি আগে থেকেই জানতে পারি

যখন তোমার আহ্বান শব্দ তোলে
নয় তা তোমার আঙুলের ছোঁয়া।
মিষ্টি ঠোঁটের নিঃশ্বাসে পাই টের
হৃদয়ের নিজস্ব গভীরতা থেকে
এক হাল্কা ব্যঞ্জনার ধোঁয়া।

"অপূর্ব সুন্দর এক মুখ সেখানে উঁকি দেয়,
সঙ্গীতে মাতামাতি, স্বর্ণোজ্জ্বল কেশে
তোলে গীতিকাব্যের অপূর্ব ধ্বনি।
তার হৃদয়ের শব্দ দ্রুততর হয়, চোখ বুজে আসে,
তখন তুমি তোমাতে নেই, আছো স্বপ্নের দেশে
আমি সম্মান দিই মুগ্ধ হয়ে শুনি।

"তার বিম্ব নিঃশব্দে আমাতে নিমজ্জিত হয়,
ফুলের মতো সৌরভ নিয়ে আমার থেকে বেরিয়ে আসে,
শব্দে শব্দে মিশে যায়।
বরং বলো, তা গভীরে নামে, ফের ওঠে চড়ায়,
তবুও তোমার কাছে তা ঢাকা মেঘের ওড়নায়
সূর্য ও নক্ষত্রেরা চারিদিক, ঘুরে যায়।

"অদ্ভুত জাদুময় আশ্চর্য বীণা তুমি,
তোমার আনন্দ ঝরে ঝরে পড়ে বুদ্বুদের মতো
ঘিরে ধরে ফুলের মালায়
তার হৃদয় উত্তেজনা আনে, চোখ জানায় আমন্ত্রণ,
তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপে, তোমার আলো উজ্জ্বলতর,
নৃত্যের বৃত্তে তা ছড়ায়।

"কেউ পান করে, কেউ গান গায় আনন্দে,
প্রতিধ্বনি তুলে বুক থেকে উড়ে যায় ভালোবাসা
কারোর হৃদয় হয় শব্দহীন।
তোমার ছিল স্বপ্ন, তোমার ছিল জীবন,
তুমি তার মধ্যে উজ্জ্বল হও, আমি থাকি তফাতে,
তুমি গর্জন করো, আমি থাকি ভাষাহীন।

"গায়ক, যদিও সৌরভ-স্বপ্নে বিভোর,
আমিও ছুঁই স্বর্গের প্রান্ত,
সোনালী নক্ষত্র দিয়ে তাকে বাঁধতে।
বাজনা শব্দ করে, জীবন অশ্রুপাত,
বাজনা শব্দ তোলে, সূর্যের আলো পরিষ্কার
সব দুরন্ত মুছে যায় তাতে ।

শেষ বিচার

একটি কৌতুক

আঃ, মৃত মানুষের সব জীবন,
হৈ-হল্লা, যা আমি শুনি,
আমার চুল হয়ে যায় খাড়া মাথার ওপর,
ভয়ে কাঠ আমার হৃদয়খানি।
যখন সব কিছুই ছিন্ন হয়,
ধস্তাধস্তির নাটক শেষ,
যখন আমাদের দুঃখের হয় অবসান,
গায়ে ওঠে চূড়ান্ত বিজয় বেশ,
আমরা মুখর হই ঈশ্বরের বন্দনায়,
হৈ-হল্লা চলে দিনরাত,
গর্বে বুক ফেটে যায়,
আনন্দ বা বেদনা কিছুই ছোঁয় না হাত।
হায়! আমি পাদানিতে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি
লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে,
কাঁপতে থাকি যে-মুহূর্তে শুনি
মৃত্যু-শয্যা ডাকে আমায় হাতছানি দিয়ে।
স্বর্গ হতে পারে শুধু একটাই,
তা দখল হয়ে আছে পুরোপুরি,
বৃদ্ধার সঙ্গে আমরা করি ভাগাভাগি
সময়ের দাঁত যাকে চেপেছে আড়াআড়ি ।
যখন তাদের দেহ থাকে কবরে,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, পাথরের নীচে,

হৈ-হৈ চীৎকারে তাদের আত্মা বেড়িয়ে পড়ে
মাকড়সার নাচের মতো ঘুরে ঘুরে।
সকলেই এত রোগা, এত পাতলা,
এতই হালকা, এতই পবিত্র,
কোথাও তাদের দেহ হয়না লীন,
যতই কবরের মুখ কর আবদ্ধ।
কিন্তু আমি তছনছ কার গোটা ব্যাপারটাই,
যেহেতু আমি স্তব্ধতা লোপাট করি চীৎকারে।
প্রভু ঈশ্বর শোনেন আমার আর্তনাদই
ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে ওঠেন তাতে।
ডাকেন তিনি সর্বোচ্চপদ দেবদূতকে,
গ্যাব্রিয়েল, কৃশকায় এবং লম্বা,
যিনি থামিয়ে দেন সব হট্টগোল
বিনা নোটিশে, সব কিছু একেবারে ঠাণ্ডা।
আমি এসবই স্বপ্নে দেখেছি শুধু, তোমরা জেনো,
এই চিন্তা নিয়ে মুখোমুখি সর্বোচ্চ আদালতে।
ভালো কথা, আমার সঙ্গে তর্ক কোর না যেন
স্বপ্ন দেখাতো অপরাধ নয় আদপে।

বীণাবাদক দুই শিল্পী

একটি ব্যালাড

"কে তোমাকে আনলো এই দুর্গে
গানের জ্যোতির্মণ্ডলে নিতে নিঃশ্বাস?
বরং তুমি খোঁজো ভালোবাসার সাথীকে
যার জন্য ভারী হয় তোমার হৃদয়ের বাতাস?"
"তাকে জানো, যে ভেতরে ভেতরে ঝড় তোলে
তোমাতে জিজ্ঞাসা রাখি, যদি সে আমায় দগ্ধ করে?
তুমি কি বলতে পারো, যদি তার চোখের দৃষ্টি
স্নেহের ছায়ায় মানুষকে তুলে ধরে?
"তার সেই দীপ্তি আমি কখনও দেখিনি,
যদিও দুর্মূল্য পাথরের জ্যোতি

জলে সেই অপূর্ব প্রাসাদের চূড়ায়
আমাকে প্রলোভিত করে নিশ্চিতই।
"সত্যিসত্যিই, হতে পারে তা আমার জন্মস্থান,
হতে পারে এটাও আমার স্বদেশভূমি,
আঃ, তাকে নন্দিত করেছিল দক্ষিণ বাতাস
রক্তিম আভায় তার আশ্চর্য কানাকানি।
"আমার স্বর এখানে মুক্ত হয়ে ছড়ায়
আমার বুক ফুলে ফুলে ওঠে ঢেউয়ে।
সোনালী বীণার তারে বাজে ঝঙ্কার
যেমন ওঠে বেদনায়-আনন্দেতে।
"আমি চিনি না সেই পরম প্রভুকে
হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে স্বর তোলে,
অথবা সেই স্বর্গীয় পরিবেশ
দুর্গ যাকে গোপনে জড়িয়ে রাখে।
"শিরায় শিরায় আমার আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ,
আমার জন্য খোলে না সেই সুরভিত দরোজা।
আমি আভূমি নতজানু, বিষণ্ণ স্নেহের তাপ,
আমি গাই গান, শ্রদ্ধায় ভালোবাসা।"
হতাশায় সে মাথা নাড়ে, ঝাঁকায় কেশদাম,
ভেঙে পরে অঝোর কান্নায়,
চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পরে, রাখে চুম্বন
ঘিরে ধরে তাকে বুকের উষ্ণতায়।
"আমিও আবদ্ধ থাকি গোপন বন্ধন মায়ায়
এই পবিত্র মন্দিরে।
সন্ধান করি দেশ থেকে দেশান্তরে
রহস্য উন্মোচিত হয় বিদ্যুৎ শিখায়।
"কিন্তু জলন্ত শিশির উথলে পরে কেন,
করুণ বেদনায় অশ্রুজল?
ইচ্ছে করলে আমরা দেখতে পারি সেই দৃশ্য
ফুলে ঢাকা প্রান্তর নৃত্য-উচ্ছল।

আমাদের হৃদয় হতে পারে আরো পরিপূর্ণ,
দুঃখ আসতে পারে আরো মিষ্টি হয়ে।
দৃষ্টি মনে হতে পারে উজ্জ্বল,
সুন্দরতম হতে পারে বিজয়ে।
"এসো, আমরা বরং একটা কুটির খুঁজি
যেখানে আমরা গাইব আমাদের গর্বের গান,
যেখানে মিষ্টি পশ্চিম বাতাস খেলা করে
হৃদয়ের গোপন সংগ্রামের তান।"
কেটে যায় দিন, তারা থাকে দীর্ঘসময়,
ঘটনাস্রোতে ভেসে আসে সুর,
তারা ঢোকে বিষণ্ণ শব্দ তুলে
যেন অজস্র পাখী এবং অজস্র ফুল।
একদা, তারা দুজনেই যখন ঘুমোয়
বাহুর বন্ধনে দেহ হয় আবদ্ধ
নরম এবং গভীর শৈবাল শয্যায়,
ঠিক তখনই আসে দীর্ঘ সেই দৈত্য।
সে তাদের তুলে নেয় সোনার পাখায়;
যেন তারা বাঁধা জাদুর নির্দেশে,
আর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই কুটির
সেখানে তখন অপূর্ব সুর বাজে।

এপিগ্রাম

এক

মূর্খ, বধির হাতওয়ালা আরাম কেদারায়
জর্মনীর মানুষ বসে থাকে অপেক্ষায়।
এখানে-ওখানে ওঠে ঝড়,
আকাশ মেঘে ঢাকে, কালো অন্ধকার।
বিদ্যুৎ ঝলকায়, সাপের মতো
অনুভবে আবিষ্ট।
কিন্তু সূর্য যখন মেঘ সরিয়ে মুখ বাড়ায়,

মৃদু মৃদু বাতাস, ঝড় শান্ত হয়,
তারা তখন নিজেরাই নড়ে, গোলমাল অবশেষে,
লিখে ফেলে কেতাব : বিপদ কেটে গেছে ;
তোলে দাবি, উদ্ভট সব আজগুবি,
গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে, করে মাতামাতি,
ধরে নেয়, এ হলো স্বর্গের কোনো গণ্ডগোল,
এই সব ধাঁধা খেলতে হলে, যদিও ভালো,
ধীরে ধীরে এগোতে হবে হিসেব করে ;
আগে মাথা, তারপর পা ঘষতে হবে ;
শিশুদের মতো তারা করে খেলা
অতীতকে নিয়ে মাতামাতি সারা বেলা ;
ভাবে এইভাবেই পৌঁছে যাবে বর্তমানে,
স্বর্গ এবং পৃথিবী এগোক নিজেদের পথ পানে ;
তারা চলে ঠিক আগের মতোই আবার,
তরঙ্গ ধাক্কা খায় পাহাড়-বেলায়, উথাল-পাথার।

দুই

হেগেলকে নিয়ে

১

যেহেতু আমি আবিষ্কার করেছি চূড়া এবং গভীরতা সব কিছুর,
আমি ঈশ্বরের মতো কঠিন, তারই মতো অন্ধকার পরিবৃত।
আমি সন্ধান করে ফিরেছি সমুদ্র-ভাবনার ;
পেয়েছি নিজেকে সেই শব্দে : তাই আমি নিয়েছি অনশন ব্রত।

২

আমি সবাইকে শিখিয়েছি যেসব কথা মাখামাখি শয়তানী কাদায়,
সুতরাং ভাবতে পারে যে-কেউ কি সে ভাবতে চায় ;
সেখানে নেই তো কোনো নির্ধারিত সীমান্ত,
বন্যা থেকে ভেসে ওঠে, পাহাড় থেকে ছড়ায়।
তাঁর প্রিয় শব্দ এবং ভাবনা নিয়ে কবিরা খেলা করে ;
সে বোঝে কি সে ভাবে, কি সে আনে অনুভবে।

প্রত্যেকেই তাহলে টেনে নিতে পারে যশের অমৃত-সুধা ;
তোমরা সকলেই জানো, আমি ছড়াই শুধু শূন্যের প্রাচুর্যতা।

৩

কাণ্ট এবং ফিখ্‌টে ঘুরেছেন নীলিমায় আকাশের,
দূর কোনো দেশের সন্ধানে,
কিন্তু আমি চাই চেহারা সম্পূর্ণ এবং সত্যের
এবং আমি তা পাই সাধারণ পথে-ঘাটে।

৪

ক্ষমা করে দাও ওই এপিগ্রাম-ওয়ালাদের
বিকৃত করে যারা গানের।
হেগেলে আমরা ডুবে আছি পুরোপুরি
কিন্তু তাঁর নন্দনতত্ত্বে আমাদের ডুবতে এখনো বাকি।

তিন

জর্মনরা একদা নাড়িয়েছিল তাদের কাঠের হাত-পা ;
'জনগণের বিজয়' দিয়ে মেরেছিল টেক্কা।
তারপর সব যখন শেষ
প্রতিটি জায়গায়, প্রত্যেকে
পড়ল : "তোমাদের জন্য মজুত আছে জিনিস চমৎকার—
দুই-এর বদলে তিনটি করে পা-এর বাহার !"
প্রত্যেকেই খেল নাড়া এবং ধীরে ধীরে
প্রত্যেকেই ডুবে গেল অনুশোচনার গভীরে।
"বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, অথচ ছিল সহজ।
আমাদের ফের ভাবতে হবে, নতুন বোধ।
সব থেকে ভালো বাকিটা ছাপানো
ক্রেতারা সহজেই পাবে, যাবে না হারানো।"

চার

তাদের জন্য রাতের গভীরে নামিয়ে আনো নক্ষত্র
তারা বিবর্ণ হয়ে জলে, অথবা উজ্জ্বল অতিরিক্ত।
সূর্যের রশ্মি হয় চোখকে দেয় ঝলসে
অথবা বিকিরণ করে দূর বহুদূর থেকে।

পাঁচ

শিলারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কারণ আছে,
যে খুব সাধারণ মানবিকতায় পারে না বুঝতে।
যার মন ভাসে দূর সুদূরে,
সে তো জড়িত নয় দিনের গভীরে।
শুধু বজ্র এবং বিদ্যুৎকে নিয়ে খেলা তার
জানা তো নেই সাধারণ মানুষের ব্যবহার।

ছয়

কিন্তু গ্যয়টের স্বাদ চমৎকার, ভিন্ন ;
নিকৃষ্টে নেই দৃষ্টি, সৌন্দর্যে মগ্ন।
যদিও তিনি অন্যদের মতোই ভাবনা নে'ন নীচ থেকে
কিন্তু নিয়ে যান আমাদের দূর ঊর্দ্ধলোকে।
কথাকে তিনি সহজ সরল রাখেন,
ভাবের জটিলতাকে কাটিয়ে ওঠেন।
শিলার নিঃসন্দেহে গুণের অধিকারী
তাঁর চিঠিতে পাবে তার পরিচয় ভুরিভুরি।
সাদা-কালোতে আঁকা আছে তাঁর চিন্তা
যদিও দুঃসাধ্য তার অর্থকে বোঝা।

সাত

কেশহীন মস্তককে নিয়ে
বিদ্যুৎ যেমন ঝলকায়
মেঘে-ঢাকা আস্তরণের ফাঁক দিয়ে,
তেমনি বিজয়ী পাল্লাস এখনো
উদ্‌গত হয় জিউসের মাথা থেকে।
এমনকি, লাগাম-ছাড়া রঙ্গপ্রিয়তায়
মহিলার ভাবনা থাকে তার মাথায়।
গভীর থেকে যা সে পারে না তুলতে
দৃশ্যত ঝলকায় মাথার খুলিতে।

আট

পুসতকুশেন[১]

১

তার ধারণা, শিলার কম বিরক্তিকর
যদিও এর বাইরে সে পড়েছে শুধু বাইবেল।
কেউ হয়ত প্রশংসা করতে পারে 'ঘ বেল'
যদি তাতে থাকে উত্থান সুন্দর।
অথবা বলে, কেমন করে খ্রীষ্ট
গর্দভের পিঠে চড়ে শহরে প্রবিষ্ট ;
অথবা ডেভিডের পরাজয় ফিলিস্টাইনে
হয়ত অতিরিক্ত সংযোজন ভালেনস্টাইনে।

২

গ্যয়টে মহিলাদের করতে পারেন আতঙ্কিত,
বয়স্কাদের প্রতি তিনি অবশ্য ন'ন যুক্তিযুক্ত।
তিনি প্রকৃতিকে জানেন, আর সেখানেই ঝামেলা,
প্রকৃতিকে নিয়ে তাঁর খেলা নয়ত নীতি-ছাড়া।
তাঁর উচিত ছিল পাওয়া লুথারের তত্ত্ব, পিঠ চাপড়ানি
আর তা থেকে নেওয়া কাব্যের কানাকানি।
তাঁর আছে কিছু চমৎকার ভাবনা, যদিও মাঝে মাঝে বিরক্তিকর
কিন্তু দিয়েছেন বাদ উল্লেখে—'সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর।'

৩

একেবারেই আশ্চর্যের এই ইচ্ছা
গ্যয়টেকে উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে তুলে ধরা।
আসলে কতটা নীচে তাঁর অবস্থান, তাঁর দেশ—
তিনি কি কখনও আমাদের দিয়েছেন ধর্মের উপদেশ ?
গ্যয়টে-তে তুমি আমায় দেখাও তো মোদ্দা কিছু কথা
কৃষক বা সাধারণ মানুষের জন্য হয়েছে রাখা।

---

১. লেখক য়োহান ফ্রিডরিখ ভিলহেলম পুসতকুশেন, যিনি গ্যয়টেকে অনুসরণ করে একই নামে একটি বই লিখেছিলেন। পুসতকুশেন-এর অন্য অর্থ গরম হাওয়া অথবা মূর্খতা।

এমন এক প্রতিভাবান চিহ্নিত হন প্রভুর বৃত্তে
এই সহজ আত্মিক আঘাত তাকে ফেলেছে ভূতলে।

৪

বরং শোনো ফাউস্টের কথা, একেবারে খাঁটি,
কবির প্রশ্ন সেখানে নির্ভেজাল বিকৃতি।
ফাউস্ট কানেকানে দেয় মন্ত্রণা
পুরোপুরি লম্পট, বাজী ধরে তাস খেলা।
তখন কিন্তু ওপর থেকে কোনো সাহায্যের হাত আসে নি,
তাই সে চেয়েছিল এর অসম্মানজনক সমাপ্তি।
কিন্তু আবৃত ছিল ভয়ের অনুভবে
নরকের, তার তীব্র যন্ত্রণা ও ক্ষতে।
তাই সে উচ্চারণ করেছিল যত
শিক্ষা, কর্ম, জীবন, মৃত্যু ও ধ্বংস।
আর এসম্পর্কে বলা যায় প্রচুর
ভাসা ভাসা রহস্য রোমাঞ্চের সুর।
কবি তো পারে না সরাসরি বলতে
কেমন করে দুর্বলতা মানুষকে নিয়ে যায় নরকে শয়তানের হাতে।
যার কোনো অস্তিত্বের দাম নেই, সে
বাতিল করতে পারে মুক্তির পথ অতি সহজে।

৫

ইস্টারের দিন থেকেই ফাউস্ট চিন্তাক্লিষ্ট
কেন শয়তান করে এত বিরক্ত?
ইস্টারের দিনে ভাববার সাহস যে পায়
সে তো মরবেই নরকের আগুনের ঝাপটায়।

৬

বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রমাণিত।
পুলিসও তা পেয়ে যাবে ভূরিভূরি,
তারা তাকে ধরবে নিশ্চিত
নিয়েছে সে বহু অর্থ ঋণ, চম্পট তাড়াতাড়ি।

৭

একমাত্র লাম্পট্যই পারে ফাউস্টকে বাঁচাতে
যে নিজেকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে।
ঈশ্বর ও পৃথিবীতে তার সন্দেহ,
যদিও মোজেজ ভাবে দুটোই হবে ধ্বংস।
মূর্খ যুবক গ্রেৎশেন তাকে শ্রদ্ধা করে
কোনোরকম প্রশ্ন করার পরিবর্তে,
তাকে বলে, সে হলো শয়তানের পোষ্য
বিচারের দিন কাছেই আসছে ক্রমশঃ।

৮

সেখানেই আছে 'চমৎকার আত্মা'-র ব্যবহার। ব্যাপারটা সোজা
চশমাটা খুলে নাও, সন্ন্যাসিনীর ঘোমটা।
"ঈশ্বর যা করেছেন ভালোই করেছেন",
অতঃপর খাঁটি কবি শুরু করলেন।

শেষ এপিগ্রাম

যতই খুশী তুমি ময়দা ঠাসো
রুটিওয়ালার লোক থেকে বেশি কিছু নও।
এবং তারপর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে
কি পথ নিয়েছ তুমি গ্যয়টের সমকক্ষ হতে?
সে তো জানেই না তোমার পেশা
অথচ প্রশ্ন, এ কেমন ধারা প্রতিভা?

সংহতি

তুমি কি দেখেছ সেই মোহময় ছবি
যখন হৃদয়ে হৃদয় যুক্ত হয়,
আর তখন নরম হালকা বাতাস
ভালোবাসা ও সুরে আশ্চর্য ধ্বনিময়?
তারা ফুটে ওঠে গোলাপের মতো, টকটকে লাল,
কখনও লজ্জাশীলা, লুকোয় তারা শয্যায় শৈবাল।

সারা দেশ তুমি খুঁজে দেখো,
কোথাও পাবে না সেই মোহময় ছবি
সেই জাদু পারে না বাঁধতে
পারে না আনতে সূর্যের রশ্মি।
কোনো সূর্যের আলোই পারে না জন্ম দিতে তার
সে জানেই না কি চাই পৃথিবীর।

সে চিরজ্যোতিষ্মান হয়ে থাকে,
যদিও আঘাত আসে সময়ের শব্দে
যদিও অ্যাপোলো অশ্ব ছোটায়
যদিও পৃথিবী মুছে যায় শূন্যতায়।
শুধু তার নিজের শক্তিই সৃষ্টি করে তাকে
পৃথিবী বা ঈশ্বর, নয় কারোরই আধিপত্যে।

যেন ঠিক সিথার্ণ শব্দ করে,
যেমন খেলা করে বীণার তার,
অনন্ত ঔজ্জ্বল্যে, অসীম দীপ্তিতে
শব্দ ওঠে অতল স্নেহ ও ভালোবাসার।
একবার যদি কান পেতে শোনো সেই সুর,
নিজেরই বুকেতে, পারবে তো না যেতে বহুদূর

উদ্বেগ

একটি ব্যালাড

১

অলঙ্কারে আপাদমস্তক সজ্জিতা
বেগুনী পোষাক, সে দাঁড়ায়
চিকচিক তার লজ্জা
বুকের ভেতরে লুকায়।
খেলা করে চমৎকার সৌরভে
তার চুলে মিষ্টি গোলাপ,
কয়েকটা যেন তুষারকণা
অন্যেরা রক্তিম, আগুনের তাপ।

কিন্তু গোলাপ তো দোলে না
তার বিবর্ণ মুখচন্দ্রিমায়
সে ডুবে থাকে যেন বিষণ্ণ বেদনা
যেন হরিণী ধরা পড়ে গেছে খাঁচায়।

ভীরু কম্পমান, অসহায়ভাবে তাকায়
হীরকের মতো ছটা নিয়ে।
শিরায় শিরায় রক্ত ছুটে যায়
চিবুক থেকে হৃদয়ে।

"আমি ধাক্কা খেয়েছি আবার
উল্লাসের মিথ্যা প্রলোভনে,
আমার হৃদয় বিচলিত বেদনায়
আমার অস্থির পদক্ষেপে।

"হৃদয়ের উথাল-পাথার সমুদ্রে
মাথা চাড়া দেয় নানা ইচ্ছা
এই পোষাকই যথেষ্ট,
এত ভালোবাসাহীন, এতই ঠাণ্ডা।

"আমি বুঝতেই পারি না,
কি আমার বুকের ভেতরে জ্বলে ;
দেবতারাই তা পারে ধরতে
মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

"আমি যন্ত্রণাকে সইব
আলিঙ্গন করব মৃত্যুকে,
স্বর্গকে করতে পারি অলঙ্কৃত,
নতুন দেশ দেখা হতে পারে।"

সে তাকায় অশ্রুভরা দৃষ্টিতে
স্বর্গের বিদ্যুৎ প্রভায়,
তার হৃদয়ের রহস্য
দীর্ঘশ্বাসে ক্রমশঃ ছড়ায়।

শয্যা নেয় সে, শান্ত প্রতিমা
প্রার্থনা রাখে শেষবার

আচ্ছন্ন করে গভীর নিদ্রা
দেবদূত শিয়রে তার।

২

এরপর পার হয়ে গেছে বহু যুগ,
তার গাল বসে গেছে।
আরও শান্ত সে, বিষণ্নতায় ভরপুর,
আরও যেন দূরে, গভীরে মিশেছে।
কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সংগ্রাম চলে,
বিক্ষোভ-বিদ্রোহে জর্জর,
ঐশ্বরিক শক্তিরা ভয়েতে দোলে ;
হৃদয় তার বিদ্রোহে থরোথর।
স্বপ্ন দেখছিল সে একদিন
নিমীলিত তার শয্যায়,
ভাসছিল সে শূন্যতায়···
সহসা গভীরে তূণ।
তার চাহনি স্থির দৃষ্টি
অর্থহীন, শূন্য, অসার।
সে গর্জন করে, চমক সৃষ্টি,
যেন ঝোড়ো হাওয়ার।
তার চোখ ফেটে বেড়িয়ে আসে রক্ত
কিছুই পারে না থামাতে।
মনে হয় যেন বেদনা প্রশমিত,
জ্বলে ওঠে আত্মার রশ্মিতে।
"স্বর্গের দরোজা প্রস্তুত
শ্রদ্ধায় আমি নত,
আমার আশা হবে পূর্ণ,
নক্ষত্রের কাছে রব।"
বিবর্ণ ঠোঁটের কম্পনে
যেন তার প্রাণ মুক্তি চায়
অবশেষে ইথারের দেশে
মুক্ত প্রাণ ভেসে যায়।

লড়াই-ই তাকে নিয়ে গেল
রহস্যময় আলোকে।
তার জীবন ছিল এতই শান্ত,
এতই রিক্ততা এই পৃথিবীতে।

মানুষ ও বাজনা
একটি কাহিনী

ড্রাম তো মানুষ নয়, মানুষও নয় ড্রাম,
ড্রাম যথেষ্ট চতুর, মানুষ বোকা হাঁদারাম।

ড্রাম বাঁধা থাকে ফিতে দিয়ে, মানুষ বাঁধা নিজেতেই,
ড্রাম কিন্তু ঠিক বসে থাকে, অথচ মানুষ ওল্টাবেই।

রাগী লোকটি ড্রাম পেটায়, ড্রাম জুড়ে দেয় চীৎকার,
কিন্তু ড্রাম যখন ঘড়ঘড়, মানুষ তখন চিৎপাত।

শেষে যখন মানুষ মুখ তোলে, ড্রাম তাকে দেখে হাসে,
মানুষ চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলে, লজ্জায় মাথা গোঁজে।

"হেই ড্রাম, হো ড্রাম, কেন হাসো বিদ্রূপের মতো?
তুমি আমায় জিভ ভেঙাও, তুমি কি আমায় বোকা মনে করো?"

"তুমি নিপাত যাও, তুমি আমাকে উপহাস করো, ঘৃণা করো!
যখন আমি পেটাই কেন ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তোলো,
যেখানেই রাখা হয় সেখানেই লটকে থাকো?

"তুমি কি মনে করো একটা গাছ থেকে গড়েছি তোমাকে
তুমি এক স্বয়ম্ভু, একথা মানুষকে জানাতে?

'তুমি নাচবে যখন আমি বাজাবো, তুমি বাজবে যখন আমি গাইব গান
তুমি কাঁদবে যখন আমি হাসবো, তুমি হাসবে যখন ধরব তান।"

সহসা প্রচণ্ড হুঙ্কারে মানুষ ড্রামটিকে আছড়ায়,
আঘাত, আঘাত, আঘাতে জর্জর, রক্তের ধারায়।

সুতরাং ড্রামের রইলো না মানুষ, মানুষের রইলো না ড্রাম,
মানুষটি শেষে হয় বিবাগী, এই তো পরিণাম।

মানুষের গর্ব

যখন এই বিশাল প্রেক্ষাগৃহে আমি আসি
দেখি এইসব বাড়ির দৈত্যাকার চেহারা
এবং মানুষের উন্মত্ত তীর্থযাত্রা
তাদের উন্মাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
আমি অনুভব করি নাড়ীর স্পন্দন
প্রাণের লেলিহান শিখা কি এতই গর্বোন্মাদ ?
তখন কি তরঙ্গরা তোমাকে নিয়ে আসে
জীবনে ও সমুদ্রের বন্যায় ?
আমি কি সমীহ করব সেই চেহারা
ঊর্দ্ধপানে যা গর্বিত ভঙ্গিতে তাকায় ?
আমি কি জীবনে আনব সেই ঝড়
লক্ষ্য যার অনির্দিষ্টতায়।
না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃণিত লাঞ্ছিতের দল,
এবং তোমরা বিকট সব পাথরের চাঁই,
দেখো, এই চোখ কেমনভাবে এড়ায়
দগ্ধ করে প্রাণের গতিশীলতাই।
চোখ মেপে দেখে ত্বরিতে গোটা বৃত্ত,
সব কিছুর খুঁটিনাটি অনুসন্ধান,
আকাঙ্ক্ষা হয় না তৃপ্ত
উপহাস করে, তারপর প্রস্থান।
যখন তোমরা প্রত্যেকে ডুবে যাও।
টুকরো টুকরো পৃথিবী চতুর্দিকে
যদিও জ্বলে তা মিটিমিটি,
যদিও ধ্বংস দাঁড়িয়ে থাকে।
সেখানে তো নেই কোনও সীমানা
আমাদের পথে নেই কোনও বিপত্তি বা বাধা,
আমরা পাড়ি দিই সমুদ্র
দেশ থেকে দেশে, ছড়িয়ে আছে যতো।
কেউই পারে না আমাদের যাত্রাকে রুখতে,
কেউই আবদ্ধ করে না বুকের আশা

মেলে দেয় সে সৌন্দর্যের পাখা
বুকের ভেতরের আনন্দ ও বেদনাকে এক করে।
বিকট বিকট চেহারা এতই বিশাল
চূড়া ঢাকা থাকে ভীতিতে,
অনুভব নয় তো ভালোবাসার প্রকাশ
যা সৃষ্টি করে তাকে অর্থহীন ভাষাতে।
দৈত্যাকার কোনো স্তম্ভই তো আকাশ ছোঁয় না
একা একা, বিজয়ী :
একটি পাথর আরেকটিকে জড়িয়ে থাকে
শম্বুককে করে পরিশ্রমী।
কিন্তু হৃদয় সবাইকে কাছে টেনে নেয়,
তার শিখা যেন আর এক দৈত্য ;
এমন কি তার পতনেও,
ধ্বংসের যন্ত্রণা ছুঁড়ে দেয় সূর্য।
অন্তর থেকে তা নিঃসৃত
উঠে যায় দূর আকাশসীমায়,
তার গভীরে দেবতাদের আনাগোনা
চোখে তার বজ্র বিদ্যুৎ ঝলকায়।
এতটুকুও দোলে না সে, একবিন্দুও
যেখানে ভাসে ঈশ্বর-ভাবনা,
বুকে ধরে রাখে সৌরভ
প্রাণের মহত্বই একান্ত প্রার্থনা।
সেই মহত্বকে গ্রহণ করতেই হবে,
মহত্বেই তার নিমজ্জন
আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙে যায়
জড়ো হয় যতো শয়তান।
অহংকারে স্ফীত হয় প্রাণ,
তোলে উপহাসের সিংহাসন ;
পতন পরিণত হয় বিজয়ে
নরকের পুরস্কার চিহ্নিত অস্বীকারে।

কিন্তু যখন উভয়ে মিলিত হয়,
যখন তুই আত্মা ভাসে একত্রে
এ তখন বলে ওকে
দরকার নেই আর এই ভাবাতে।
তখন সমস্ত পৃথিবী শোনে সঙ্গীত
ইয়োলিনের সুরে সুরে,
চিরন্তন সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে
ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা এগিয়ে চলে।
য়েনী! আমি কি বলতে পারি স্পর্দ্ধায়
ভালোবাসায় আমরাও করেছি হৃদয়ের বিনিময়,
তারাও হয় স্পন্দিত, উজ্জ্বল,
তাদের তরঙ্গেও থাকে বিদ্যুতের পরিচয়।
ধাতুর দস্তানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই
পৃথিবীর মুখের ওপর।
দৈত্যেরা ফিসফিস ষড়যন্ত্র করে,
পারে না কাড়তে আমার তৃপ্তির সুর।
ঈশ্বরের মতো আমি থোরাই কেয়ার করি
জয়ের শব্দে কম্পিত ভেঙে পড়া বৃত্ত
প্রতিটি শব্দই বজ্র ও আগুন
স্রষ্টার মতো ফুলে ওঠে আমার বক্ষ।

সান্ধ্য ভ্রমণ

"পাহাড়ের দিকে স্থিরদৃষ্টি কেন তোমার,
কেন মৃতু দীর্ঘশ্বাস?"
"বাতাসে রঙ ছড়ায় সূর্য
পাহাড়কে চুম্বন করে বিদায় জানায়।"
"এ জিনিস তো তুমি দেখোনি কখনও—
সূর্যের আলো কিভাবে মণ্ডিত করে
সকালের আকাশ, ফের মধ্যাহ্ন থেকে
হয়ে আসে নিষ্প্রভ, ধীরে ধীরে ঘরে ফেরে?"
কিন্তু আমি দেখেছি, সেই উজ্জ্বল প্রভা
রক্তের রঙে জ্বলে ওঠে,

যতক্ষণ না চোখ নিমীলিত
রেখে যায় স্নেহের সুবাসে।
আমরা হেঁটে বেড়াই। তার পদরেখায়
চিহ্নিত থাকে শৈল-শিখর।
হালকা বাতাস আঁকে চুম্বনের আলপনা,
চোখে মিষ্টি স্পর্শ, আহ্লাদে মুখর।
ভালোবাসার দুর্বলতায়, আমি রাখি দীর্ঘশ্বাস ;
সে কাঁপে রক্ত-গোলাপের মতো।
তার হৃদয়ে রাখি মাথা, নীচে ডুবে
যায় সূর্য, নক্ষত্র যতো !
"এই বিস্ময়ই আমাকে টানে পাহাড়চূড়ায়
সেই কারণেই মৃদু দীর্ঘশ্বাস।
সে ভেসে যায় সন্ধ্যাতারার মতো বহুদূর,
দূর থেকে জানায় বিদায় নমস্কার।

নক্ষত্রের গান

তুমি নাচো ঘুরে ঘুরে,
আলোকের ঝর্ণাধারায়,
তোমার প্রতিবিম্ব পড়ে
অসংখ্য অনন্ত ছায়ায়।
এখানে দ্রবীভূত হয় মহত্তম হৃদয় ;
বিস্ফোরিত দ্বিধাবিভক্তে
সোনার মধ্যে হীরা যেমন জ্বলে তেমনি
সিক্ত হয় মরণের বেদনাতে।
সে দৃষ্টি সরায় তোমার দিকে
নিঃশব্দ স্থির ভঙ্গীতে
শিশুর মতো তোমার ভেতর থেকে
আশা এবং ভালোবাসা তুলে নেবে।
হায়, তোমার আলো তো আর নেই,
ইথারের চেয়েও তা উধাও।

কোনো দেবতারই ক্ষমতা নেই,
তোমাতে ফের আগুন ধরায়।
মিথ্যাই তুমি প্রতিবিম্ব
জ্বলন্ত শিখার মুখ ;
হৃদয়ের উত্তাপ এবং আকুতি
তুমি রাখো না শব্দের বুক।
তোমার দীপ্তি নিতান্তই এক প্রহসন
কাজ, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষায়।
তোমার ওপর ঝরে পড়ে স্নেহ
হৃদয়ের তপ্ত সঙ্গীত সাধনায়।
আমরা শেষে ধূসর বিবর্ণ হয়ে যাবো,
হতাশা ও বেদনায় নিঃশেষ,
তখনই অবস্থাটা দেখো,
থাকবে পৃথিবী ও স্বর্গ অবশেষ।
আমরাও যখন শিহরিত কম্পনে
আর আমাদের মধ্যে ডুবে থাকে পৃথিবী,
গাছের শাখা তো হয় না বিদীর্ণ
নেমে আসে না নক্ষত্রের দৃষ্টি।
তোমার মৃত্যু তাহলে নিশ্চিত
সমাধি মহানীল সমুদ্র
সমস্ত নিভে যায়, রশ্মি-দীপ্ত
সমস্ত আগুন তোমাতে বিদ্ধ।
তুমি নিঃশব্দে বলো সত্য
মৃত্যুর আলোকে খেলা নয়
স্পষ্টতায় নয় প্রকাশ্য
চারিদিক অন্ধকার হয়।

এক নাবিকের সঙ্গীত

তুমি উতরোল হতে পারো, আঘাতে আঘাতে ঘূর্ণী,
আমার নৌকোর চারপাশে, তোমার খেলায়,

আমাকে তুমি নিয়ে যাবেই লক্ষ্যে জানি
যেহেতু তুমি আছো নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়।

ওই নীল তরঙ্গ প্রবাহের নীচে,
আমার ছোট ভাই লুকিয়ে আছে।
তুমিই তাকে নিয়েছ ডেকে
তার অস্থি তোমাতে গচ্ছিত আছে।

আমি ছিলাম বালক, বেশি কিছু নয়;
সে বেড়িয়েছিল ঝোড়ো হাওয়ায়
দাঁড় সামলাতে পারে নি সে
গভীর অতলে হারিয়ে যায়।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি
লবণাক্ত সমুদ্রে হাত রেখে,
প্রতিশোধ চাই একদিনই
ধ্বংস করব নির্মমভাবে!
সেই উচ্চারণকে আমি রেখেছি অস্তিত্বে
করিনি বিশ্বাসঘাতকতা,
দাঁড়ের আঘাতে আঘাতে করেছি ছিন্নভিন্ন
ভুলেই গেছি ডাঙায় ফিরে যাওয়া।
যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে
তরঙ্গের মাথায় মাথায় পর্বত
যখন সামুদ্রিক তুফান তোলপাড়
ক্রুদ্ধ বাতাস তোলে গর্জন,
আমি উঠে আসি শয্যা থেকে,
নিরাপদ উষ্ণ আবেশ,
শান্ত শীতল আশ্রয় ফেলে রেখে,
বাতাস ও ঝড়কে করব শেষ।

বাতাস ও ঢেউয়ের সঙ্গে করি যুদ্ধ
ঈশ্বরে রাখি প্রার্থনা,
অভিযান সফল হোক
নক্ষত্র করে পথ রচনা।

নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয় নিঃশ্বাসে
আনন্দ ও উল্লাসে
আর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জার এই খেলায়
বুকের ভেতর থেকে গান উঠে আসে।
তুমি উতরোল হতে পারো, আঘাতে আঘাতে ঘূর্ণী,
আমার নৌকোর চারপাশে, তোমার খেলায়,
আমাকে তুমি নিয়ে যাবেই লক্ষ্যে জানি
যেহেতু তুমি আছো আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়

ম্যাজিক জাহাজ
একটি রোমান্স

পাল নেই অথবা আলো, তবুও সেই জাহাজ
দিনরাত ঘোরে পৃথিবীর চারধারে,
সাগরে চাঁদের আলো চিকমিক
বাতাস লেগে থাকে মাস্তুলে।
সেটি চালায় ভূতের মতো এক কর্ণধার.
তার শিরায় নেই রক্তের কল্লোল,
তার চোখ থেকে ঝরে না আলো
তার মস্তিষ্কে নেই চিন্তার হিল্লোল।
ঢেউ ফুলে ওঠে, বন্য ও উদ্দাম
আছড়ে পড়ে পাথরে
লাফ দিয়ে মাস্তুল ছোঁয়, ক্ষতি হয় না কিছুই
পরমুহূর্তে নেমে আসে আঁধারে।
যতক্ষণ বিক্ষুব্ধ সাগর মাতামাতি করে
রক্তস্নানে মাখামাখি
কর্ণধার আতঙ্কিত হয়ে থাকে
যেন শোনে অমঙ্গলবাণী
আত্মারা চীৎকার করে প্রতিহিংসায়
বাতাসের ওপর-নীচ সর্বত্র।
কর্ণধার ডুবে থাকে বিবর্ণতায়
জাহাজ ছুটে চলে, উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্য।

দূর দূর দেশে যায় সে
যেখানেই দেখে তটরেখা,
দর্পণ-আগুনে জ্বলে ওঠে,
যখন পায় সমুদ্রের ভালোবাসা।

বিবর্ণা কুমারী

বিবর্ণা এক কুমারী দাঁড়িয়ে থাকে,
নিঃশব্দ একাকী হৃদয়,
তার মিষ্টি প্রাণ
এখন ছিন্নভিন্ন যন্ত্রণায়।
সেখানে চমকায় না কোনো আলোর রেখা,
বাতাস নিঃস্তরঙ্গ
সেখানে ভালোবাসা ও বেদনা খেলা করে
পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব।
শান্ত ছিল সে, একেবারে গম্ভীর,
স্বর্গীয় নিবেদনে,
যেন বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি
ঔজ্জ্বল্যের আবরণে।
এমন সময় এলো এক নাইট
বিশাল রথেতে চড়ে;
তার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল
ভালোবাসার সমুদ্র বেয়ে।
ভালোবাসা আনে কুমারীর বুকে দুর্বলতা,
কিন্তু নাইট চলে যায়,
যুদ্ধ জয়ের তৃষ্ণা আকণ্ঠ;
ত্বরিতে সে সাড়া দেয়।
সমস্ত শান্তি মুহূর্তে উধাও,
স্বর্গ হয় চুরমার,
হৃদয়, সে-তো দুঃখের কাঁটা,
ডুবে যায় বারবার।
যখন দিন হয় অবসান,
নতজানু মেঝেতে সে

প্রভু খ্রীষ্টের কাছে রাখে
রাখে প্রার্থনার আবেশে।
কিন্তু এগিয়ে আসে অন্য মুখ
আসে এক অন্য ভঙ্গীমা
ঝড়ের মতো সে নিতে চায় কুমারীর মন
ভাঙতে চায় তার আত্মবেদনা।
"তুমি তো দিয়েছ আমাকে প্রেম
অনন্ত সময়ের ধারায়।
স্বর্গকে তোমার হৃদয় দেখানো
সে তো ছলনার ছায়ায়।"
কুমারী কেঁপে ওঠে আতঙ্কে
বরফের মতো স্তম্ভিত
ভয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়
অন্ধকারের বৃত্ত।
যন্ত্রণায় সে ছড়ায় তার সুশুভ্র হাত
ঝরে পড়ে কান্না।
"বুকেতে জ্বলুক আগুন
হৃদয় হোক পান্না।
"স্বর্গকে আমি পদাঘাত করি,
আমি জানি তার চেহারা।
আমার হৃদয় ছিল ঈশ্বরে নিবেদিত
এখন চাই নরকের প্রহরা।
"সে ছিল দীর্ঘকায়, হায়
দৃপ্ত পবিত্রতা।
তার চোখ অন্তহীন,
এতই মহৎ, এতই সুন্দরতা।
"সে তো রাখেনি আমার ওপর
তার দৃষ্টি এতটুকুও
আমাকে থাকতে দাও একাকী
যতক্ষণ হৃদয় নিঃশেষিত।
"তার হাত সে রাখতে পারতো
দিতে পারতো আনন্দ;

কিন্তু সে দিল শুধু দুঃখ
অসীম অনন্ত।
"আমার হৃদয় থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হবো
আমার সমস্ত আশা,
সে কি তাকাবে আমার দিকে
খুলে দেবে হৃদয়-দরোজা।
"যেখানে সে নেই, নেই তার আলো
সে তো নিথর ঠাণ্ডা দেশ
দুঃখ যেখানে ভরে থাকে শুধু
বেদনায় হয় নিঃশেষ।
কিন্তু এখানে ফুলে ওঠা বন্যা
আমাকে দিতে পারে শান্তি
হৃদয়ের রক্তের উত্তাপকে ঠাণ্ডা
বুকের গভীরে অনুভবের ব্যাপ্তি।
সে উচ্চারণ করে তার আশা
বাতাসে ভাসিয়ে দেয়
কালো রাত্রির অন্ধকারে
সে যেন হারিয়ে যায়।
তার হৃদয় আগুনে পুড়ে,
চিরদিনের মতো নিঃশেষ ;
তার দৃষ্টির দিগন্ত,
ভরে যায় কালো মেঘ।
তার মিষ্টি এবং সুন্দর ঠোঁট
বিবর্ণ, রক্তহীন।
তার দেহ, তার আঙ্গিক
শূন্যতায় হয় লীন।
খসে পড়ে না একটি পাতাও
কোনও বৃক্ষ থেকে
স্বর্গ এবং পৃথিবী নিশ্চুপ
তাকে জাগায় না ঘুম থেকে।
পাহাড়, উপত্যকা পেরিয়ে
বয়ে যায় শান্ত বাতাস

নিয়ে যায় তার কঙ্কাল
কোনো পর্বতের চূড়াতে।
দীর্ঘকায় এবং গর্বিত সেই নাইট
ঘিরে ধরে তার ভালোবাসা,
সিথার্ণে হিল্লোল ওঠে
নিখাদ প্রেমের গাঁথা।

স্বপ্ন

একটি ডিথিরাম্ব

স্বপ্নেতে আমি মশগুল
রচনা করি দৃশ্য মধুর সৌরভে
চারিদিকে রাখি আবেশ
আমার চুলের রেশ;
রাত্রি গভীরতর, হৃদয়ে রক্তের স্ফূর্তি
স্বপ্নের তরঙ্গে অগ্নিময় মূর্তি,
ভাবনা শুধু আসে আর যায়
তন্ত্রীতে সঙ্গীতের দীর্ঘশ্বাস, ভালোবাসায়।
স্বপ্ন মুখর হয়, সোনালী রোদ্দুর,
ছোট বাড়িখানা যেন ভেসে যায় বহুদূর,
আমার কেশদামে নামে ঢেউ,
অন্ধকারে শুভ্র কন্যা কেউ,
ভেসে আসা সঙ্গীতে রক্ত গতিময়,
পাথরের শিখার চারধারে ঘুরে বেড়ায়,
সূর্য দীপ্ত হয় আলোরচ্ছটায়,
আমার হৃদয় প্লাবিত স্বর্গময়।
পতন আতঙ্কিত করে সবাইকে,
কিন্তু বিশাল নায়ক শুধু আমাতে,
আগুন তার সম্মোহনী স্থির দৃষ্টিতে,
বীণার সুর বাজে বিশ্ব জুড়ে,
আমার হৃদয় বাজে বজ্রসঙ্গীতে
সূর্য ভালোবাসা, পাহাড় দুঃখে,
বিনম্র-গর্বে আমি ডুবে যাই,
উদ্ধত-গর্ব আমার বুক ভাসায়।

ঝড়ের সঙ্গীত

১

বেহালা বাদক

শিল্পী বীণার তারে হাত রাখে
তার হালকা বাদামী চুল সে সরায়
তার পাশে রাখা এক উন্মুক্ত তরবারি
যাকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়।
"শিল্পী, ওই ভয়ঙ্কর শব্দ তুমি তোলো কেন?
কেন তুমি তোলো যুদ্ধের আহ্বান!
কেন উত্তাল সমুদ্রের মতো তুমি রক্ত?
কে তোমাকে ছোটায় উন্মাদের মতো রিক্ত?"
"কেন আমি বাজাই! অথবা মত্ত তরঙ্গ করে গর্জন?
যাতে পাথরের গায়ে সে আঁকে বর্ষণ
চোখ যাতে অন্ধ হয়, হৃদয় মাতাল,
হৃদয়ের কান্না আনে অন্ধকার পাতাল।"
"শিল্পী, কেন তুমি হৃদয় সিক্ত করো ঘৃণায়।
এক আলোকিত ঈশ্বর দেয় শিল্প তোমায়,
যাতে তুমি সুরে আনতে পারো মূর্ছনা,
আকাশে নক্ষত্র-নৃত্যে সৌন্দর্যের আলপনা।"
"তাতে কি! আমি ছুটি, ছুটে বেড়াই ব্যর্থহীন
আমার রক্ত-কালো অস্ত্র তোমার অন্তরে গহীন।
ঈশ্বর সেই শিল্পকে চায় না, চায় না জানতে,
নরকের কালো কুয়াশা থেকে তা বেড়িয়ে আসে।
"যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয় মুগ্ধ হয়, অনুভব আবেশে:
শয়তানকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিদ্ধ করি আঘাতে।
সে সংকেত আঁকে, আমাকে দেয় সময়
আমি বাজাই মৃত্যুর বাজনা, দ্রুত ঝঞ্ঝাময়।
"আমি বাজাবো ঘূর্ণী, বাজাবো উদ্দাম।
যতক্ষণ না সুরের আঘাতে হৃদয় খানখান।"
শিল্পী বীণার তারে হাত রাখে
তার হালকা বাদামী চুল সে সরায়
তার পাশে রাখা এক উন্মুক্ত তরবারি
যাকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়।

২

স্বপ্নময় ভালোবাসা

উন্মত্তের মতো সে তাকে জড়িয়ে ধরে,
তার চোখেতে রাখে চোখ।
"বেদনা তোমাকে প্রিয় এতই বিদ্ধ করে
আমার নিঃশ্বাসে রাখো তোমার দুঃখবোধ
"ওহ, তুমি কেড়ে নিয়েছে আমার হৃদয়,
আমার হৃদয় জ্বলে তোমার পরশে
আমার রক্ত তোমাতেই প্রস্ফুটিত।
উজ্জ্বল হও, যৌবন-শোণিতে।"
"প্রিয়তমা, এমন আশ্চর্য সুন্দর তোমার মুখভঙ্গিমা।
চমৎকার সংলাপ অভিষিক্ত।
কান পেতে শোনো, গভীর স্বরের বাজনা,
উতরোল জগৎ-বৃত্ত।"
"ধীরে, প্রিয়তমা, ধীরে,
নক্ষত্রেরা উজ্জ্বল হয় উজ্জ্বলতর।
চলো আমরা যাত্রা করি স্বর্গের পথে
আমাদের হৃদয় মিশে যাক দৃঢ়তর।
তার কণ্ঠস্বর নীচে নামে, ফিসফিস,
বেপরোয়া, সে তাকায়।
আগুনের দৃপ্ত শিখায়
তার চোখ খুঁজে বেড়ায়।
তুমি টেনে নিয়েছ বিষ, ভালোবাসা।
আমার সঙ্গেই তুমি শেষ।
ওপরে আকাশ অন্ধকার,
আমি তো দেখিনা সকালের রেশ।
আতঙ্কে সে তাকে জড়িয়ে ধরে আরো কাছে॥
বুকের ভেতরে বয়ে যায় মৃত্যুর ঝড়।
বেদনা তাকে বিদ্ধ করে, ক্ষয়ে যায়,
চোখ বুজে আসে শেষবার।

১৮৩৭-এ লেখা। প্রথম প্রকাশিত হয় আথেনাউম পত্রিকায় ১৮৪১-এর ২৩ জানুয়ারি। জীবিতকালে মার্ক্সের একমাত্র মুদ্রিত কবিতা।

চিঠিপত্র

বের্লিনে থাকার সময় মার্ক্স অজস্র চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পিতাকে। কিন্তু তার মধ্যে একটিই মাত্র পাওয়া গেছে। বাকি চিঠির কোনো খোঁজ নেই। য়েনীকেও চিঠি লিখেছেন প্রচুর। তারও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পিতার কাছে লেখা চিঠিটি এক অমূল্য দলিল। কারণ সমসাময়িক কাল ও ও মার্ক্সের মানসিক পরিস্থিতি, তাঁর কাব্যভাবনা ও বুদ্ধি-চর্চা, যাবতীয় বিষয়ের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। চিঠিটি ইংরিজীতে এর আগে প্রকাশিত এবং গ্রন্থিত হয়েছে, দ্য ইয়ং মার্ক্স (লণ্ডন, ১৮৯৭), রাইটিংস অব দি ইয়ং মার্ক্স অন ফিলজফি অ্যাণ্ড সোসাইটি (নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৭) এবং কার্ল মার্ক্স : আর্লি টেক্সট্স (অক্সফোর্ড, ১৮৯৭)-এ। এ যৌথ উদ্যোগের সমগ্র রচনাবলিতে। জর্মনে প্রথম প্রকাশ ১৮৯৭ সালে ডি নয়ে ৎজাইট প্রথম সংখ্যায়। লাসালেকে লেখা চিঠিটি মার্ক্সের নাট্যসমালোচক হিসেবে অন্যতম পরিচয়।

পিতাকে

বের্লিন, নভেম্বর ১০ [—১১, ১৮৩৭]

প্রিয় বাবা,

মানুষের জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আছে সীমান্তের স্তম্ভের মতো যা একটা সময়ের সমাপ্তিকে যেমন সূচিত করে তেমনি একটি নতুন পথেরও সন্ধান দেয়।

পরিবর্তনের সেই মুহূর্তে আমরা বাধ্য হই একবার অতীতের দিকে তাকাতে, বাধ্য হই ঈগলের মতো শ্যেন চিন্তাধারা নিয়ে বর্তমানের দিকে তাকাতে যাতে আমরা আমাদের আসল অবস্থান উপলব্ধি করতে পারি, বুঝতে পারি। অবশ্যই পৃথিবীর ইতিহাস এইভাবেই পেছন ফিরে তাকাতে চায়, অভিজ্ঞতায় জমা রাখতে চেষ্টা করে, যা প্রায়শই তাকে পিছিয়ে পড়া বা থেমে যাবার অবস্থাতেই পৌঁছে দেয়, যদিও আরাম কেদারায় বসে নিজের খতিয়ান বা নিজের মনকে বুঝতেই তার চেষ্টার অন্ত থাকে না।

এই রকম এক একটি মুহূর্তেই মানুষ ছান্দিক (lyrical) হয়ে ওঠে। যেহেতু প্রত্যেকটি মেটামরফসিসই অংশত হংসগীত (swan song), অংশত একটি বড় কবিতারই অনুরণন যা বিভিন্ন রঙের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে পরস্পরে মিশে গিয়ে স্থায়ী হতে চায়। আর যে ভাবেই হোক না কেন আমরা এমন একটা স্মৃতিপট রচনা করতে চাই যার মধ্যে একদা আমরা ছিলাম এবং যার মধ্যে দিয়ে আমরা আবার সেই পুরনো দিনের একটা আবেগময় অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। এবং বাবা-মায়ের হৃদয় ছাড়া আর কোন্ পবিত্র জায়গা আমরা পেতে পারি যেখানে এই অনুভব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে তীব্র দোলায়, যে-হৃদয় হলো অত্যন্ত দয়াবান বিচারক, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহানুভূতিশীল বন্ধু, ভালোবাসার সূর্য, যার নম্র উত্তাপ আমাদের প্রতিটি কর্মের অভ্যন্তরে খেলা করে বেড়ায়! এর থেকে আর ভালো সংযোজন বা ক্ষমা কি এমন থাকতে পারে যা কোনও বস্তুর অবশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সতত সঞ্চারণের দৃশ্য থেকে বেশী আপত্তিকর বা নিন্দাজনক? অন্ততপক্ষে, কেমন করে সুযোগের প্রায়শই দুর্ভাগ্যজনক খেলা এবং বুদ্ধিজনিত বিভ্রম বিস্মৃষ্ট হৃদয়ের কারণে মানুষের ভর্ৎসনাকে এড়িয়ে যেতে পারে?

অতএব, আজ এখানে একটা বছর আমাকে কাটাবার পর যখন পেছন ফিরে তাকাতে হচ্ছে, বিশেষতঃ এম্‌স থেকে লেখা তোমার অসংখ্য প্রিয় চিঠির উত্তরের জন্য, তখন আমাকে সেই জীবনযাত্রার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে কিছু বলতে দাও, বিশেষত বিজ্ঞান, কলা এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে তার অতিক্রমণ।

তোমাকে ছেড়ে যেদিন আমি চলে এলাম, তারপর এক নতুন পৃথিবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। সে পৃথিবী ভালোবাসার, প্রেমের, যদিও প্রথমদিকে খুবই আবেগপ্রবণ এবং আশাহত অবস্থায় ছিল। এমনকি আমার বের্লিন যাত্রা যা আমাকে সবথেকে বেশি আনন্দ দিতে পারত, যা আমার পক্ষে প্রকৃতিকে মনস্থ করতে উৎসাহ দিতে পারত এবং আমার জীবন-শক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারত, আমাকে একেবারে নিরুত্তাপ নিস্তেজ করে দিয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে, এটা রসিকতারও যোগ্য নয়; এখানকার পর্বতচূড়া আমার প্রাণের আবেগের তুলনায় অনেক নীচু, অনেক বেশী লীন; আমার রক্তের স্পন্দনে যে প্রাণ আছে এখানকার বড় বড় শহরগুলোর তাও নেই; আমার সঙ্গে নিত্যদিন যে ফ্যাণ্টাসীর ঝোলা আছে এখানকার হোটেলগুলোর খাবার তার থেকে কোন অংশেই মনোহর বা বেশী সুস্বাদু বা হজমযোগ্য নয়, এবং এখানকার কোন শিল্পকলাই য়েনীর থেকে বেশী সুন্দর নয়।

বের্লিনে এসে আমি আমার বর্তমান সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি, যাতায়াত বা বেড়োন হয় কদাচিৎ, হলেও একান্ত অনিচ্ছা ভরেই। চেষ্টা করেছি গভীরভাবে বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে যেতে।

এইসময়ে মনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র ছন্দোবদ্ধ কবিতাকেই গ্রহণ করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম প্রথম বিষয় রূপে, অন্ততপক্ষে অত্যন্ত আনন্দময় এবং প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে এবং আগের সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল সম্পূর্ণ আদর্শবাদী। আমার স্বপ্নরাজ্য, আমার শিল্প হয়ে এলো পেছনে ফেলে আসা এক জগত, ঠিক আমার ভালোবাসার মতন। যা কিছু বাস্তব তাই যেন হয়ে এলো অস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট কোনকিছুরই কোন সঠিক বহিঃরেখা নেই। য়েনীকে পাঠানো আমার প্রথম তিনটি বইয়ের সমস্ত কবিতাই আমাদের কালের আক্রমণের দ্বারা চিহ্নিত, পরিব্যাপ্ত অথচ অনুভবের অপরিণত প্রকাশ, কোন কিছু প্রাকৃতিক নয়, সবকিছুরই সৃষ্টি যেন চাঁদের আলোকচ্ছটায়, কি আছে আর কি হওয়া উচিত ছিল এই বিরুদ্ধতায় পরিপূর্ণ, কাব্যিক চিন্তার পরিবর্তে কাব্যিক ছন্দের প্রতিফলন যেন এখানে। কিন্তু সম্ভবতঃ অনুভবের উত্তাপ এবং কাব্যিক উষ্ণতার আবেশও এখানে আছে। অসীম, অনন্ত এক সুদীর্ঘ চিন্তা যেন এখানে নানান আঙ্গিকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে এবং কাব্যিক গ্রন্থনাকে করেছে পরিব্যাপ্ত।

সুতরাং আমার একমাত্র সঙ্গী হতে পেরেছে বা হয়েছে কবিতা। আমাকে আইনও পড়তে হবে এবং সর্বোপরি দর্শনের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের একটা তাগিদও অনুভব করছি। এই দুটো এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে একদিকে স্কুলের ছেলেদের মতো সমালোচনায়

দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকেই আমাকে পড়তে হচ্ছে হাইনেসিউস, থিবাউত বা ওইজাতীয় কিছু যার ফলশ্রুতিতে আমি প্যানডেক্টের দুটি বই জর্মনে অনুবাদ করে ফেলেছি ; এবং অন্যদিকে, সমগ্র আইনশাস্ত্র সম্পর্কে আইনের দর্শনকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছি। অধিবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু কিছু তত্ত্বের সাহায্যে একটা সূচনার আকারে আমি একটা আলোচনাও শুরু করেছি যার কাজ প্রায় তিনশ পাতার মতো এগিয়ে গেছে।

এখানেও সবার ওপরে, যা আছে এবং যা থাকা উচিত ছিল—এই দুইয়ের পরস্পর বিরুদ্ধতা গুরুতর ভ্রান্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা আদর্শবাদের সাধারণ চরিত্র, এবং বিষয়বস্তুর হতাশজনক নির্ভুল বিভাজনের সূত্র। প্রথমেই আমি যার কথা বলতে চাই সেটা হলো আইনের অধিশাস্ত্র, অর্থাৎ, মূল নীতি, প্রতিফলন বা প্রকাশ, ধারণার সংজ্ঞা, এবং সমস্ত আসল আইন ও আইনের আসল আঙ্গিক থেকে তার বিচ্যুতি, যা ফিখ্‌ট-এতে ঘটেছে, শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রেই অনেক আধুনিক এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই মূল সত্যকে আড়াল করবার জন্যে একটা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় যাকে বলতে পারি আঙ্কিক গোঁড়ামির অবৈজ্ঞানিক প্রকাশরূপ। গ্রন্থকার যুক্তি ছড়াচ্ছেন একবার এখানে একবার সেখানে, একই বিষয়ের মধ্যে বারবার ঘোরাফেরা করছেন কিন্তু বিষয়টাকে এমন একটা পর্যায়ে আনছেন না যাতে সেটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, যাতে বিষয়টির বহুমুখী আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। যুক্তি তৈরী এবং প্রমাণ করতে একটি ত্রিবৃত্ত গনিতজ্ঞকে কিছু সুযোগ দেয়, কিন্তু শূন্যের মধ্যে ধারণাটা হয়ে দাঁড়ায় খুবই বিমূর্ত এবং এর আর কোন পরবর্তী প্রবাহ বা প্রকাশ থাকেনা। এর পাশে অন্য কিছু রাখলে তবেই অবস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং এই সংযুক্ত বিভাজ্যতাই একে বিভিন্ন সম্পর্ক এবং সত্যের সন্ধান দেয়। অন্যদিকে চিন্তার প্রাণময় জগতের সুদূর প্রকাশে, যেকথা আইনে বা নিয়মে রাষ্ট্রে, প্রকৃতিতে এবং সামগ্রিকভাবে দর্শনে পরিস্ফুট হয়, নিজস্ব প্রবাহে মূল লক্ষ্যও অবশ্য অধ্যয়নযোগ্য; ইচ্ছাকৃতভাবে বিভেদপন্থাকে এখানে ঢোকানো হবে না, নিজের মধ্যে যে সব বৈপরীত্য আছে তার সংঘাতের মধ্যে দিয়েই বস্তুর পূর্ণ বিকাশ হোক এবং সেই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ঐক্যের সঞ্চার হোক।

অতঃপর দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে আসছে আইন বা নিয়মের দর্শন, অর্থাৎ আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে সঠিক রোমান আইনে ধারণা বা চিন্তার বিকাশের একটা পরীক্ষা (আমি শুধুমাত্র এর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা সুযোগকে বোঝাতে চাইছি না) যেন ধারণাভিত্তিক বিকাশে সঠিক আইন আইন-সম্পর্কিত ধারণার আঙ্গিক থেকে ভিন্নতর কিছু হতে পারত। এর প্রথমাংশ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার।

উপরন্তু আমি এই অংশটিকে আচারগত আইন (formal law) এবং বাস্তব আইন (material law)-এ ভাগ করেছি। প্রথমটি হলো সমগ্র পদ্ধতিটির বাহ্যিক আঙ্গিক, এর পারস্পরিক যোগাযোগ, বিভিন্ন অধ্যায় এবং তার পরিব্যাপ্তি ইত্যাদি। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা করে তার বিষয়বস্তু, দেখায় যে কেমন করে আঙ্গিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মিঃ স্যাভিগনির সঙ্গে এই ভুলটাও আমি করেছিলাম এবং সেটি আমি আবিষ্কার করেছিলাম মালিকানা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বইটিতে; আমাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এখানেই, উনি ধারণাটির যে প্রচলিত সংজ্ঞা প্রয়োগ করেছিলেন ভ্রান্ত রোমান পদ্ধতির কোনও না কোনও তত্ত্বের মধ্যে যেন তা একটা মিল বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়। বাস্তব সংজ্ঞা বা মেটেরিয়াল ডেফিনিশান হচ্ছে পজিটিভ কনটেণ্ট বা সঠিক বিষয়ের পরিচিতি যা রোমানরা এই পদ্ধতিতে কোন ধারণা প্রকাশ করত। কিন্তু আমি মনে করি ফর্ম বা আঙ্গিক হলো ধারণাগত প্রকাশের প্রয়োজনীয় স্থাপত্য এবং বিষয় হলো এই প্রকাশের গুণগত ঔৎকর্ষ। আমার বিশ্বাসের মধ্যে ভুলটা হলো এই যে, বিষয় এবং আঙ্গিকের বিন্যাস অবশ্যই আলাদাভাবে হতে পারে। এবং এই কারণেই আমি কোনও প্রকৃত আঙ্গিক পাইনি, যা পেয়েছি তা হলো বালি ভর্তি ড্রয়ারওয়ালা একটা ডেস্ক।

আঙ্গিক এবং বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ রক্ষা করছে ধারণা বা কনসেপ্ট। সুতরাং আইনের দার্শনিক বিচারে একটি আরেকটির মধ্যে বিকশিত হবে ঃ অবশ্যই আঙ্গিক হবে বিষয়ের ছায়ারেখা। সুতরাং আমি সমস্ত বস্তুটিকে এমনভাবে ভাগ করতে চাই যাতে যে-কোন ব্যক্তি বা গবেষকই তার নিজের মতো করে সহজভাবে ভাগ এবং ব্যাখ্যা করে নিতে পারেন। সমস্ত আইনই বিভক্ত দুটি ধারায়। চুক্তিগত (Contractual) এবং চুক্তিহীন (non-contractual)। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য আমি সাধারণ আইনকে (public law) ভাগ করে একটা পরিকল্পনা পেশ করছি, আচারগত অংশেও (formal part) তা বলা হয়েছে।

Jus privatum (Private law)	Jus publicum (Public law)

1. Jus Privatum

(১) শর্তাধীন চুক্তিগত ব্যক্তিগত আইন (Conditional Contractual Private law)

(২) নিঃশর্তাধীন চুক্তিহীন ব্যক্তিগত আইন (Unconditional non-contractual Private Law)

ক. শর্তাধীন চুক্তিগত ব্যক্তিগত আইন

(১) ব্যক্তির আইন (২) বস্তুর আইন (৩) সম্পত্তি-সম্পর্কে ব্যক্তির আইন

(১) ব্যক্তির আইন

অ. বাণিজ্যিক চুক্তি আ. সনদ বা অধিকার ই. বন্ধকী চুক্তি

অ. বাণিজ্যিক চুক্তি

এক. আইনগত বিষয়ের চুক্তি (Societas)

দুই. আইন বহির্ভূত বিষয়ের চুক্তি (Locatio conductio)

আইনবহির্ভূত বিষয়ের চুক্তি :

১. যখন সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত :

ক. শুধু চুক্তি (রোমান পদ্ধতিতে ভাড়া বা লীজ দেওয়া ব্যতীত)

খ. কমিশন

২. যখন কোনকিছু ব্যবহারের অধিকারভুক্ত :

ক. জমির ওপর

খ. বাড়ির ওপর

আ. সনদ বা অধিকার

১. ইচ্ছাকৃত চুক্তি ২. বীমা চুক্তি

ই. বন্ধকী চুক্তি

১. অঙ্গীকারপূর্ণ চুক্তি (বন্ধক রেখে, কমিশন ছাড়া)

২. দান চুক্তি (দান, সমর্থনের অঙ্গীকার)

(২) বস্তুর আইন

অ. বাণিজ্যিক চুক্তি

ক. মূল অর্থে বিনিময় খ. ধার ও সুদ গ. ক্রয়-বিক্রয়

আ. সনদ বা অধিকার

ই. বন্ধকী চুক্তি

ক. ধার ও ধার চুক্তি

খ. বন্ধকী দ্রব্যসমূহ নিরাপদে রাখা

কিন্তু আমি বাতিল করেছি এমন সব চিন্তা নিয়ে পৃষ্ঠা ভর্তি করব কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই তিনটি ভাগে বিভক্ত। খুবই ক্লান্তিকর আর বিরক্তিময় অবস্থার মধ্যে এটা লেখা। আর রোমানদের ধারণাগুলোকে অত্যন্ত বর্বরোচিত উপায়ে অপব্যবহার করা হয়েছে যাতে তারা বাধ্য হয় আমার পদ্ধতি গ্রহণ করতে। অন্যদিকে, এইভাবে

বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আমি লাভ করেছি। আমার তা ভালোও লেগেছে, অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে।

বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিগত আইনে পুরো ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা বলে আমার মনে হয়েছে, যার মূল পরিকল্পনা ছিল কাণ্টকে কেন্দ্র করে, কিন্তু কাজের বেলায় তা সেই পথ থেকে সরে এসেছে। এবং তার ফলে আমার কাছে এটা আবারও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে দর্শন ছাড়া কোন গতি নেই। সুতরাং সজ্ঞানে এবং সুস্থচিত্তেই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি এবং অধিবিদ্যক নীতির একটা নতুন পদ্ধতি রচনা করেছি। কিন্তু উপসংহারে আমি আবারও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে এটা ভুল, যেমন ভুল আমার ইতিপূর্বের সমস্ত প্রচেষ্টা।

এই কাজ করার সময় আমি সেই বই পড়তে পড়তে সারসংক্ষেপ টুকে রাখার অভ্যেসটাকে কাজে লাগিয়েছি। যেমন লেসিং-এর লাওকুন, সোলগের-এর এরভিন, ভিঙ্কেলমান-এর শিল্পের ইতিহাস, লুডেন-এর জর্মনীর ইতিহাস পড়বার সময় তা করেছি এবং আমার প্রতিফলনও সেখানে কিছুটা ঘটেছে। পাশাপাশি আমি অনুবাদ করেছি তাসিতুস-এর গেরমানিয়া এবং ওভিদের ত্রিস্তিয়া এবং নিজে নিজেই শিখতে শুরু করেছি ইংরিজী এবং ইতালীয় ভাষা। অর্থাৎ ব্যাকরণ বাদ দিয়ে। তবে এই নিয়ে এখনও কোথাও উপস্থিত হইনি। তাছাড়া পড়েছি ক্লাইনের ক্রিমিন্যাল ল এবং তার সমস্ত গ্রন্থ এবং সম্প্রতিকালের প্রায় সমস্ত সাহিত্য, যদিও শেষটি অন্যান্যগুলো পড়বার পরিপ্রেক্ষিতেই।

এই কর্মসূচীর শেষে আমি আবারও দেখেছি মিউজের নৃত্য, শুনেছি স্যাটির-এর সঙ্গীত। যে খাতাখানা তোমাকে আমি ইতিপূর্বেই পাঠিয়েছি তাতে আমার আদর্শবাদ কখনও প্রকাশিত হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রসিকতায় (স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স) এবং একটি ব্যর্থ ফ্যানটাসটিক নাটকে (অউলানেম) এবং ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না চূড়ান্তভাবে তা বিবর্তিত হয় এবং পুরোপুরি নিয়ম মাফিক শিল্পে পরিণত হয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই এর উৎসাহের সূত্র লক্ষ্যহীন এবং চিন্তার ভাবাবেগ মিশ্রিত।

এবং যদিও এই শেষ কবিতাগুলোই একমাত্র যার মধ্যে হঠাৎ করে যেন কোনও জাদুর স্পর্শে—সেই স্পর্শ ছিল প্রথমে চকিত আঘাত—সার্থক এবং সত্যিকারের কবিতার ঔজ্জ্বল্যকে আমি দেখেছিলাম বহুদূরের এক স্বপ্নময় প্রাসাদের মতো। এবং আমার সমস্ত সৃষ্টিই শূন্যতায় পরিণত হয়েছে। এইসব বিভিন্ন ধরণের কাজ নিয়ে, প্রথম দিকে আমি বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি, বহু সংগ্রাম করেছি এবং ভেতরে ও বাইরে বহু উত্তেজনাকে সয়েছি। তথাপি এই সমস্ত কিছুর শেষে আমার নিজের অবস্থার কোন উন্নতিই হয়নি। উপরন্তু আমি অবহেলা করেছি প্রকৃতিকে, শিল্পকে

এবং এই পৃথিবীকে, এবং বন্ধু-বান্ধবের দরজাও বন্ধ করে দিয়েছি। ইতিপূর্বে উচ্চারিত সমস্ত পর্যবেক্ষণই আমার দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছিল গ্রামের দিকে যেতে এবং এই প্রথম আমি সদর দরজা পেরিয়ে, সারা শহর অতিক্রম করে স্ট্রালাউতে গেলাম। আমার কাছে এমন কোন আশাব্যঞ্জক সংকেত ছিল না যে সেখানে মানসিক দুর্বলতা থেকে আমি পরম শক্তিধর ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবো।

একটা পর্দা পড়ে গেছে, পবিত্রের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি এখন বিপরীতমুখী। এবং নতুন ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হয়েছে সেখানে।

কাণ্ট এবং ফিখ্‌টের আদর্শবাদের সঙ্গে যে-আদর্শবাদের তুলনা আমি করেছি তা থেকে আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যা বাস্তবের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে পারে। যদি ইতিপূর্বে ঈশ্বরেরা পৃথিবীর ওপরে বা উর্দ্ধে বিচরণ করে থাকেন তবে এখন তাঁরা কেন্দ্রভাগে উপস্থিত।

হেগেলের দর্শনের প্রতিটি অংশ আমি পড়ে দেখেছি, এক হাস্যকর ছন্দহীন সংগীত যা আমার কাছে কোন আবেদনই রাখতে পারেনি। আরও একবার আমি সমুদ্রের নীচে ডুবে দেখতে চেয়েছিলাম, তবে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে যে, মনের প্রকৃতি দেহের প্রকৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ভালো অসি খেলোয়াড়ের মতো কিছু কসরৎ দেখানোই আমার লক্ষ্য ছিল না, আমি চেয়েছিলাম সত্যিসত্যিই কিছু রত্নকে দিনের আলোয় তুলে আনতে।

আমি চব্বিশ পৃষ্ঠার একটা ডায়ালগ লিখেছিলাম : ক্লিন্থেস, অর দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যাণ্ড নেসেসারী কনটিনিউয়েশন অব ফিলজফি। বিভাজিত হয়ে যাওয়া শিল্প এবং বিজ্ঞান এখানে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং এক উৎসাহী পান্থের মতো আমি এর মধ্যে দেবত্বের দার্শনিক-দ্বন্দ্বাত্মক হিসেবটা দেখাতে চেয়েছি, কেমন করে তা প্রস্ফুটিত হয়, একটি স্বতন্ত্র আদর্শে, অথবা ধর্মে, অথবা প্রকৃতি কিংবা ইতিহাসে। আমার শেষ প্রস্তাব ছিল হেগেলীয় পদ্ধতির সূচনা! এবং এই কাজটি, যার জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গেও আমাকে কিছুটা পরিচিত হতে হয়েছিল, শেলিং, এবং ইতিহাস, যা আমার মস্তিষ্ককে অবিরাম চালনা করেছে এবং যা এতই (···) ভাবে লিখিত (বস্তুতপক্ষে একটি নতুন তর্কশাস্ত্র হিসেবে প্রতিপাদ্য হওয়াই ছিল এর লক্ষ্য) যে এখনও এর সম্পর্কে চিন্তা করতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়। এই কাজটিই আমার প্রিয় সন্তান, চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, মিথ্যা শব্দের মতো আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে।

কয়েকদিন ধরেই এক বিরক্তি আমাকে কিছু চিন্তা করতে দিচ্ছে না। সারা সময় শুধু হৈ-হল্লা করে কাটাচ্ছি। হৈ-হল্লার এই জলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। চা গলে যায়।

আমার ল্যাণ্ডলর্ডে'র সঙ্গে এক শিকার অভিযানে শেষপর্যন্ত আমি অংশগ্রহণ করলাম। বের্লিন পর্যন্ত ছুটেছি এবং কাছে টেনে নিতে চেয়েছি রাস্তার প্রতিটি লোফারকে।

এর কিছু পরেই আমি কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করলাম। যেমন স্যাভিগনির ওনারশিপ। ফয়েরবাখ এবং গ্রলমানের ক্রিমিন্যাল ল। ক্র্যামারের ডি ভারবোরাম সিগনিফ্যাকশনি, ওয়েনিং-ইংগেনহাইমের প্যানডেক্ট সিসটেম এবং ম্যুহলেনব্রুথ-এর ডকট্রিনা প্যানডেকটারাম, যা আমি এখনও পড়ছি এবং সবশেষে লাউটেরবাখ্-এর সিভিল প্রসিডিওর সম্পর্কে কয়েটি প্রবন্ধ এবং ক্যানন ল। ক্যানন ল-এর প্রথম অংশ গ্রাশিয়ান-এর কনকরডিয়া ডিসকরডানটিউম ক্যাননাম পড়েছিলাম করপাস থেকে এবং তার সারাংশ বা বলা যায় পরিপূরক হিসেবে পড়েছিলাম লান্সেলত্তি-র ইনস্তিতিউসনেস। এর পর আমি আরিস্টটল-এর রেটোরিকের কিছু অংশ অনুবাদ করি। বেকন অব ভেরুলামের দ্য আউগমেন্তিস সায়েন্তিয়ারুম পড়ি। রাইমারুজকে নিয়ে সময় কাটাই, পশুদের শিল্প-প্রবৃত্তি সম্পর্কে যাঁর বই আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল। সেই সঙ্গে জর্মন আইনও নাড়াচাড়া করি, অবশ্য সেই পর্যন্তই যেখানে আছে ফরাসী রাজাদের আত্মসমর্পণ এবং তাদের প্রতি পোপের চিঠিপত্র।

য়েনীর অসুস্থতার খবর এবং আমার নিষ্ফল বুদ্ধিনির্ভর পরিশ্রম, ফলে আমি যে প্রতিমূর্তিকে ঘৃণা করি ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণার ফলে তারই ফের ফিরে আসা—এতে আমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেকথা তোমাকে আমি আগেই জানিয়েছি বাবা। একটু ভালো হবার পর আমি আমার সমস্ত কবিতা ও গল্পের স্কেচ সবকিছুই পুড়িয়ে ফেলি। ভেবেছিলাম এসব কিছুই আমি দূর করে দিতে পারব। যদিও এখন পর্যন্ত তার কোনো প্রমাণই আমি রাখতে পারিনি।

যখন অসুস্থ ছিলাম তখন আগাগোড়া পড়েছি হেগেল, তাঁর অধিকাংশ ভক্তদের সঙ্গে। স্ট্রালাউ-তে বন্ধুদের সঙ্গে এনিয়ে অজস্রবার আলোচনা হয়েছে, সেখান থেকেই যাই ডকটরস ক্লাব-এ। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপক এবং তাঁদের অন্যতম হলেন আমার ঘনিষ্ঠতম বের্লিন-বন্ধু ডঃ রুটেনবের্গ। এখানে কিন্তু অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে এবং আমি অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছি আধুনিক বিশ্ব-দর্শনের সঙ্গে যা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু বন্ধন দৃঢ় হয়েছে এবং আমি সত্যিকারের এক আবেশে ডুবে গেছি। অনেক কিছু বাতিল করে দেওয়ায় এটাই অবশ্য খুব সহজে হতে পারে। তার ওপর আছে য়েনীর উত্তরহীনতা। স্বাভাবিকভাবেই দ্য ভিজিট ইত্যাদির মতো বাজে কিছু লেখা লিখে সমসাময়িক বিজ্ঞান এবং আধুনিকতা সম্পর্কে যতক্ষণ না ওয়াকিবহাল হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হতে পারছি না।

যদি আমি পড়াশোনার শেষ পর্ব সম্পর্কে সমস্ত কিছু পরিষ্কারভাবে অথবা বিস্তারিত ভাবে ঠিক গুছিয়ে না বলতে পারি এবং এই জটিলতার তীব্র সমালোচনা করি, তাহলে আমাকে ক্ষমা ক'রো বাবা। কারণ আমি চলতি সময়টার কথাই বলতে চেয়েছি শুধু।

ভি চামিশো আমাকে এক পত্রে জানিয়েছেন 'তিনি দুঃখিত যে আলমানাক আমার কবিতা ছাপতে পারছে না কারণ অনেক আগেই তা ছাপা হয়েছে। বিরক্তির সঙ্গে একথা আমায় মেনে নিতে হয়েছে। পুস্তক বিক্রেতা ভিগাণ্ট আমার পরিকল্পনা ডঃ শ্‌মিড্‌ট-এর কাছে পাঠিয়েছেন। ডঃ শ্‌মিড্‌ট হলেন ভুণ্ডার-এর প্রকাশক যাঁরা ভালো এবং সস্তা সাহিত্যের ব্যবসাই করে থাকেন প্রধানতঃ। আমি তাঁর চিঠিটা সঙ্গে পাঠালাম। শ্‌মিড্‌ট-এর কাছ থেকে এখনও কোনো উত্তর আসেনি। যাইহোক, পরিকল্পনাটা আমি বাতিল করছি না।। বিশেষ করে হেগেলবাদী ভাবনার নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বাউয়ের-এর সাহায্যের মাধ্যমে সমস্তরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাদের মধ্যে বাউয়ের-এর ভূমিকা এবং প্রভাবও প্রচুর। তাছাড়া ডঃ রুটেনবের্গও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আইনশাস্ত্রকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা সম্পর্কে বলি, আমি সম্প্রতি জনৈক ন্যায়-নির্ধারক শ্‌মিড্‌টথ্যেনার-এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন তৃতীয় আইন পরীক্ষার পর এটিকে বিচার শাস্ত্রে বদলে নিতে। যেহেতু প্রশাসন বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মধ্যে জুরিসপ্রুডেন্স-ই আমি বেশি পছন্দ করি তাই বিচার শাস্ত্র আমার পছন্দ মতো হবে। এই ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, তিন বছরের মধ্যে তিনি নিজে এবং ভেস্টফালিয়ার ম্যুনস্টার হাই প্রভিন্সিয়াল কোর্টের অনেকেই এই ন্যায়-নির্ধারকের পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সেটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। একটু খাটতে হবে ঠিকই, কিন্তু বের্লিন বা অন্যত্র ধাপগুলো যতটা কড়া ওখানে ততটা নয়। ন্যায়-নির্ধারক হিসেবে পরে যদি কোন ব্যক্তি ডক্টর ডিগ্রী পান তাহলে অ-সাধারণ অধ্যাপকের একটা পদ পেয়ে যাবার সুযোগও প্রচুর। যে-ঘটনা ঘটেছে বন-এর গ্যের্টনারের ক্ষেত্রে। আঞ্চলিক আইন সম্পর্কে অতি সাধারণ একটা বই লিখেছেন তিনি। অন্যথায় একজন হেগেলবাদী বিচারপতি হিসেবেই তিনি পরিচিত। কিন্তু, প্রিয় বাবা, এসব কিছু নিয়ে একটু মুখোমুখি বসে কি তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যায় না? এডুয়ার্ডের অবস্থা, মায়ের অসুস্থতা, তোমার শরীর খারাপ, যদিও আমি আশা করি সেটা এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়—এই সমস্ত কিছু আমাকে তোমার কাছে এখুনি যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। অবশ্যই এটা প্রয়োজন। তোমার অনুমোদন এবং সম্মতি সম্পর্কে যদি আমার নিশ্চিত সন্দেহ না থাকত তাহলে এতক্ষণে আমি তোমার শুধু হৈ-হল্লা ক'- য়েতাম।

বিশ্বাস করো বাবা, আমার কোন স্বার্থপর অভিসন্ধি নেই, (যদিও য়েনীর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার পক্ষে স্বর্গসুখ), কিন্তু একটা ভাবনা আছে যা আমাকে তাড়না করছে, এবং এই ভাবনাটা এমনই যা প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। অনেকাংশেই আমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, যেমন আমার প্রিয়তমা য়েনী লিখেছে, যখন পবিত্র কর্তব্য পালনের প্রশ্ন ওঠে তখন এইসব বিবেচনা কোনো হিসেবেই আসেনা।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি বাবা, তুমি যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, অনুগ্রহ করে এই চিঠি, এই চিঠির একটি পৃষ্ঠাও মাকে দেখিওনা। আমার হঠাৎ পৌঁছে যাওয়া হয়ত এই বৃদ্ধা এবং চমৎকার মহিলাকে সুস্থ করে তুলবে।

মায়েব কাছে লেখা চিঠিটা য়েনীর চিঠি আসার অনেক আগে লিখেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই হয়ত কিছু কিছু বিষয়ে অবসিকের মতো বেশি কথা লিখেছিলাম যা বলা ঠিক হয়নি।

আমাদের সংসারে যে মেঘ জড়ো হয়েছে আশা করি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আশা করি তোমার সঙ্গে আমিও বেদনা সহ্য করতে পারবো এবং কাঁদতে পারবো, অন্ততপক্ষে তোমার সঙ্গে আমিও প্রমাণ করতে পারবো কি অনন্ত ভালোবাসা এবং সহানুভূতি আমার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি তা ভালোভাবে প্রকাশই করতে পারিনি। এবং আশা করি তুমিও, আমার প্রিয় বাবা, আমার অস্থির মনের অবস্থা বিবেচনা করে আমার সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবে। আশা করি তুমি শীগগিরই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে যাতে আমি তোমাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে পারি এবং তোমাকে খুলে বলতে পারি আমার সমস্ত চিন্তাভাবনার কথা।

তোমার চিরভালোবাসার পুত্র

কার্ল

আমার কুৎসিত হাতের লেখা আর বলার বাজে ভঙ্গীকে মার্জনা করো বাবা। এখন ঘড়িতে চারটে। মোমবাতি ফুরিয়ে এসেছে, ভারী হয়ে এসেছে আমার চোখ। সত্যিকারের এক অস্থিরতা গ্রাস করেছে আমায়। আমি ঝোড়ো ভূতকে কিছুতেই শান্ত করতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার একান্ত প্রিয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পারছি।

অনুগ্রহ করে আমার মিষ্টি য়েনীকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। আমি ওর চিঠি এরই মধ্যে বারো বার পড়ে ফেলেছি এবং প্রতিবারই আবিষ্কার করেছি নতুন ঔজ্জ্বল্য। লেখার ভঙ্গী তো বটেই, অন্য সব দিক থেকেও আমি মনে করি এই হলো সুন্দরতম এক চিঠি যা কোন মহিলা লিখতে পারে।

ফের্ডিনাণ্ড লাসালেকে

লণ্ডন, ১৯ এপ্রিল, ১৮৫৯

ফ্রানৎজ ফন সিকিংগেন নাটক প্রসঙ্গে আসি। প্রথমতঃ, নাটকের রচনা এবং ঘটনা বিন্যাসের জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আধুনিক জর্মন নাটকে যা রীতিমতো বিরল। দ্বিতীয়তঃ, পুরোপুরি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে রেখেই বলি, নাটকটি প্রথম পাঠেই আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। আবেগপ্রবণ পাঠকদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এই নাটকের প্রতিক্রিয়া হবে অনেক বেশি তীব্র। এই দ্বিতীয় দিকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

অন্যদিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলি: প্রথমতঃ আঙ্গিক সম্পর্কে, যেহেতু আপনি নাটকটি লিখেছেন আগাগোড়া কাব্যে, আপনার কবিতার ছন্দকে আরও শিল্পসম্মত করলে পারতেন। এই ধরনের অবহেলায় আমাদের পেশাদারী কবিরা অবশ্য ব্যথিত হতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের নব প্রজন্মের কবিরা ঝকমকে ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, নাটকে যে-দ্বন্দ্ব আনা হয়েছে তা যে শুধু বিয়োগান্ত তাই নয়, নিঃসন্দেহে বিয়োগাত্মক দ্বন্দ্ব যা, যুক্তি দেখিয়েই, ধ্বংস করে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবী পার্টিকে। এই ঘটনাকে মূল কেন্দ্র করে একটি আধুনিক ট্রাজেডি লেখার জন্য আপনাকে আমি তাই অভিনন্দন জানাই। তবুও আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, আপনি যে বিষয়টা বেছে নিয়েছেন তা এই দ্বন্দ্বকে উপস্থিত করার পক্ষে উপযুক্ত কি-না। বালথাজার হয়ত সত্যিসত্যিই কল্পনা করতে পারেন যে সিকিংগেন যদি নাইটদের পারস্পরিক দ্বন্দের পেছনে তাঁর বিদ্রোহের কথা গোপন রাখার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতায় সোচ্চার হতেন এবং সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন, তাহলে নিশ্চিতই বিজয়ী হতেন তিনি। কিন্তু আমরা কি এই সম্মোহের অংশীদার হবো? সিকিংগেন (এবং তাঁর সঙ্গে হুটেনও কিছুটা) যে আগে নিহত বা ধ্বংস হ'ন নি তার কারণ তাঁর ধূর্ততা। কিন্তু তিনি ধ্বংস হলেন তখনই যখন নাইট হিসেবে এবং ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে তিনি চলতি শাসনব্যবস্থা বা তার নতুন কলাকৌশলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সিকিংগেনের চরিত্র থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ধারা, তাঁর নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, স্বাভাবিক ক্ষমতা ইত্যাদি বাদ দিলে যা থাকে তা হলো—গ্যোয়েৎজ ফন বের্লিশিংগেন। দুঃখলাঞ্ছিত গ্যোয়েৎজ উপযুক্তভাবেই সম্রাট ও যুবরাজদের বিরুদ্ধে নাইটদের বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং সেই কারণেই গ্যয়টে তাঁর এই নাটকে তাঁকে নায়ক করেছেন। সিকিংগেন, এবং কিছুটা হুটেন-এর ক্ষেত্রেও—তাঁর প্রতি এবং সমস্ত শ্রেণীর প্রবক্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এই ধরনের

কথাবার্তা কিছুটা বদলানো উচিত। ডিউকদের বিরুদ্ধে সিকিংগেন-এর যে লড়াই—(যেহেতু সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রশ্নটি উঠেছিল শুধুমাত্র এই কারণেই যে নাইটদের সম্রাট ক্রমেই হয়ে উঠছিলেন ডিউকদের অধিকর্তা), সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে এক ডন কুইজোটে, ইতিহাসগতভাবে যিনি সঠিক। কিন্তু নাইটদের ঝগড়া বিবাদের মধ্যে থেকে তাঁর বিদ্রোহ করার অর্থ একটাই যে তিনি তা নাইট হিসেবেই শুরু করেছিলেন। অন্যভাবে যদি করতে চাইতেন তাহলে তাঁকে সরাসরি আবেদন জানাতে হতো শহরের মানুষ এবং কৃষকদের কাছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, তাদের কাছে, যাদের সচেতনতা নাইট সম্প্রদায়কে পছন্দ করে না।

এক্ষেত্রে, গ্যোয়েৎজ ফন বের্লিশিংগেন নাটকে যে সংঘর্ষ উপস্থিত করা হয়েছে তা যদি আপনার পছন্দ না হয়—সেটা অবশ্য আপনারও পরিকল্পনা ছিল না—তাহলে সিকিংগেন এবং হুটেনকে মারা যেতেই হবে কারণ তাঁদের কল্পনায় তাঁরা নিজেরা বিপ্লবী (গ্যোয়েৎজকে অবশ্য তা বলা যায় না)। এবং ১৮৩০ সালের পোল্যাণ্ডের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মতো তাঁরা একদিকে নিজেদের আধুনিক চিন্তার প্রবক্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তাঁরা কাজ করছেন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে। বিপ্লবের অভিজাত প্রতিনিধিরা, যাদের ঐক্য এবং স্বাধীনতার সোচ্চার কণ্ঠস্বরের আড়ালে ঝলসাচ্ছিল পুরনো রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার এবং ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন—তাদের মধ্যে কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনার নাটকে সেটাই ফুটে উঠেছে। বরং কৃষকদের প্রতিনিধি (বিশেষ করে তাদেরই) এবং শহরাঞ্চলে বিপ্লবী ভাবনার যেসব লোকজন আছে তাদের একটি সক্রিয় প্রেক্ষাপট হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত। সেক্ষেত্রে আপনি তাদের আরও কিছুটা সুযোগ দিতে পারতেন, আধুনিকতম চিন্তাভাবনাকে অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরার। কিন্তু যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বাদ দিলে মূল বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় বেসামরিক ঐক্য। আমার ধারণা আপনার ভঙ্গীটা শিলারিয়ান-এর পরিবর্তে অবশ্যই শেক্সপীঅরিয়ান হওয়া উচিত। কারণ আপনি নাটকে ব্যক্তিবিশেষকে করে ফেলেছেন নিছক সময়ের মুখপাত্র। ফ্রানৎজ ফন সিকিংগেন-এর মতো লুথেরান-নাইটদের বিরোধিতাকে সাধারণের প্রতিনিধি ম্যুনৎজার-এর বিদ্রোহের থেকেও অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে কি আপনি কূটনৈতিক ত্রুটির জালে জড়িয়ে পড়েননি?

উপরন্তু, আপনার নাটকের চরিত্ররা আসল চরিত্রই পায়নি। আমি পঞ্চম চার্লস, বালথাজার এবং ট্রিয়েরের রিচার্ডের কথা বাদই দিচ্ছি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মতো আকর্ষণীয় অজস্র চরিত্র আর কোন্ যুগে আছে? আমার মতে,

হুটে্ন অতিরিক্ত মাত্রায় অনুপ্রেরণার প্রতিবিম্ব এবং তা যথেষ্ট বিরক্তিকর। কিন্তু একই সঙ্গে কি যথেষ্ট চতুর এবং শয়তানী রসিকতায় পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি নন? এবং সেক্ষেত্রে আপনি কি তাঁর প্রতি একটু বেশিমাত্রায় অবিচার করেননি?

ঘটনাক্রমে আপনার সিকিংগেন যতটা বিমূর্ত হিসেবে নাটকে এসেছে তাতে তাঁকে সংঘর্ষের শিকার হতে দেখা গেছে কিন্তু তা ব্যক্তিগত হিসেব-নিকেশের বাইরে। যেমন একদিকে তিনি যেভাবে তার নাইটদের সামনে শহরের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলেন, অন্যদিকে আনন্দের সঙ্গে তিনি জোর করে শহরের কাঁধে চাপান তাঁর পক্ষপাতিত্ব।

নাটকের বিন্যাস সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি বিভিন্ন চরিত্রের ইতস্ততঃ ছড়ানো অন্তর্দর্শনের বাড়াবাড়ি কমাবার কথা বলবো—শিলারের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্বের জন্যেই কার্যত যা ঘটেছে। যেমন ১২১ পৃষ্ঠা। হুটেন নিজের জীবন কাহিনী শোনাচ্ছেন মারিয়াকে। ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক হতো যদি মারিয়া বলতো :

"অনুভবের সব সংগ্রাম"

ইত্যাদি, থেকে

"এযেন বয়েসের ওজনের চেয়েও অনেক ভারী"।

এর আগের কাব্যমালার 'তারা বলে' থেকে শুরু করে "বৃদ্ধ হয়ে যায়" মোটামুটি আসতে পারে, কিন্তু "এক রাত্রিতেই অনূঢ়া পরিণত হয় রমণীতে" (যদিও দেখা যাচ্ছে যে মারিয়া বিমূর্ত প্রেমের চেয়েও অনেক বেশি কিছু জানে), এই কথাটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সবার আগে যেটা প্রয়োজন তা হলো নিজের বয়েসের ওপর মারিয়ার আলোকপাত দিয়ে শুরু করা। এক ঘণ্টার যাবতীয় ঘটনা বলে ফেলার পর সে তার অনুভবকে সাধারণ প্রকাশের আঙিনায় নিয়ে আসতে পারে তার বয়েসের কথা উল্লেখ করে। উপরন্তু এই কথাগুলিতেও আমি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম : "আমি মনে করি এটাই ঠিক" (অর্থাৎ সুখ)। মারিয়া বিশ্বকে যে সরল দৃষ্টিতে দেখে সেখানে ঠিক-বেঠিকের তত্ত্ব এনে তাকে মিথ্যা করে দেওয়া কেন? আশা করি পরবর্তী সময়ে বিস্তারিতভাবে আমার মতামত জানাবো।

সিকিংগেন এবং পঞ্চম চার্লসের দৃশ্যটি নির্দিষ্টভাবে সফল বলে আমার মনে হয়। যদিও দুজনেই আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলে গেছে। ট্রিয়েরের দৃশ্যগুলিও সফল হয়েছে। তরবারি সম্পর্কে হুটে্ন-এর কথাগুলি দারুন সুন্দর।

আজ এই পর্যন্ত থাক।

আপনার নাটকের একজন ভালো ভক্ত পেয়েছেন, আমার স্ত্রী। মারিয়াই একমাত্র চরিত্র যা তাঁর ভালো লাগেনি।

কার্ল মার্ক্স